পাপ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

পাপ
পাপ
পাপ

॥ এক ॥

খুব ভোরে হিরণ্ময়ের জন্য চা করতে উঠে উমা দেখল যে ভাঁড়ার ঘরটা ঠিক যেমন রাত্রিতে রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমন নেই। দরজাটা না খুলে শুধু একবার চোখ বুলিয়েই সে বুঝতে পারল কোথাও একটা কিছু ঘটেছে। এ ঘরটায় তালা দেওয়া থাকে না, শুধু কড়া দুটো রোজ দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে শুতে যায় উমা। যাতে সকালে উঠে তাড়াতাড়ির মাথায় সহজেই খোলা যায় সে জন্য দড়িটাতে উমা একটা হুট্‌কা দিয়ে রাখে।

রোজকার অভ্যাসমত হুট্‌কার ঢিলে দড়িটা ধরে টানতে গিয়ে উমা দেখল দড়িটা সহজভাবে খুলে এলনা। উমা নীচু হয়ে দেখল দড়িটাতে হুট্‌কার বদলে তিনটে গিঁট দেওয়া। দড়িটাকে কেউ এলোমেলো ভাবে তাড়াতাড়ি কড়া দুটোর মাঝখান দিয়ে পেঁচিয়েছে, তারপর খুব শক্ত করে গিঁট দিয়েছে দড়িতে। সবশুদ্ধ তিনটে গিঁট। যদি হুট্‌কার দড়িটা সরে গিয়ে থাকে কোনক্রমে তাহলে দুটো গিঁট হ'ত। তাছাড়া এরকম এলোমেলো ভাবে সে দড়ি পেঁচায় না। সে যা করে তা আস্তে আস্তে গুছিয়ে করে। সে ভেবে দেখল কাল রাতেও সে রোজকার মত দড়ি বেঁধেছিল। তারপর শুতে গিয়েছিল।

প্রথমেই চোরের কথা মনে হ'ল উমার। দড়ির প্রান্তটা ধরা অবস্থাতেই তার হাতটা কাঁপতে লাগল। সে শুনতে পেল তার দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হচ্ছে।

এ ঘরে কোন দামী জিনিসপত্র থাকে না শুধু একটা কাঠের বাক্সে দু'একটা বাসনপত্র ছাড়া। সুতরাং চোর এলেও তেমন কিছু চুরি যায় নি। তবু চোর এসেছিল এ কথাটা ভাবতে গিয়েই ভয়ে হাত পা হিম হ'ল উমার।

উমা দাঁতে দাঁত টিপে দড়ির গিঁটটা খুলতে চেষ্টা করল। গিঁটগুলো আলপিনের মাথার মতো ছোট আর শক্ত। তা ছাড়া উমার দুটো হাতই ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপছে এবং নিজের বুকে একটা অদ্ভুত গুর্‌গুর্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। হাতটা বারবার প্রথম গিঁটটা খুলতে গিয়ে দ্বিতীয় গিঁটটা নিয়ে টানাটানি করছে।

অবশেষে অতি কষ্টে খানিকটা খুলে খানিকটা টেনে ছিঁড়ে উমা দরজাটা খুলতে পারল।

দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। দু'হাট হয়ে উমার পথ করে দিল। উমা হাঁপাতে হাঁপাতে চৌকাঠের বাইরে থেকে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কারণ ঘরের ভেতরে ভোরের আবছা আলো এখনো ঢোকেনি। ঘরটা অন্ধকার। উমা ঘরে ঢুকে সেই অন্ধকারে নিজের শরীরের কাঁপুনি থামাতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের জন্য তার মনে হ'ল যে তার শরীরটা কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তার নিয়ন্ত্রণের একেবারে বাইরে চলে গেছে, যেন এই শরীরটা তার নিজের নয়।

অন্ধকারে সে কিছুই দেখছিল না। সে ভাবল এ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে তার মৃত্যু হবে। সুতরাং সে অনেক সাহস সঞ্চয় করে ঘরটা পেরিয়ে উল্টো দিকের রাস্তা-মুখো জানালাটা খুলে দিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শিশির মাখা জলকণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাল দেওয়া বালির মতো বিবর্ণ আলো ফুটল ঘরে। এবং উমা মুখ ফিরিয়ে দেখল—! প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর আস্তে আস্তে খানিকটা বুঝল।

সে যা ভেবেছিল তার চেয়ে বহুগুণে গুরুতর ঘটনা ঘটে আছে।

॥ দুই ॥

হিরণ্ময়ের দোষ উপুড় হয়ে শোওয়া। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে সে আরো কুঁকড়ে ছোট হয়ে কাঁকড়ার মতো আকৃতি নিয়ে শুয়েছিল। এবং সেই অবস্থাতেই শুয়ে, 'এক্ষুনি উমা চা আনবে'—এই ভাবনা নিয়ে হাল্কা তন্দ্রার মধ্যে সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল। সে দেখছিল উমা তার দিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করছে। ভাষাটা সে একদম বুঝতে পারছে না, তবে তার মধ্যে দু'একবার 'বাচ্চা—একটা বাচ্চা'—এই শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। সে ভাবছিল স্বপনকে জিজ্ঞেস করবে যে তাদের স্কুলে এই ধরনের কোনো ভাষা শেখানো যায় কিনা।

ঠিক এই সময়ে মাথায় একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সে চোখ মেলল। সে অবাক হয়ে দেখল যে একটা অদ্ভুত মুখ তার মশারীর ভেতর। সেই মুখটা তার খুব পরিচিত বলে মনে হল তবু সে ঠিক বুঝতে পারলো না। কারণ সেই মুখে দুটো অস্বাভাবিক বড় চোখ সে দেখতে পেল। সেই চোখের সাদা গোলাকার অংশদুটোকে তার মুর্গীর ডিমের মতো বড় বলে মনে হ'ল।

সেই মুখটা অস্বাভাবিক ভাবে তাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারছে না। একটু আগে স্বপ্নে শোনা ভাষাটার সঙ্গে বহু অনুসর্গযুক্ত এই ভাষাটার কিছু মিল আছে।

এই ভাবেই ঘুমের প্রথম ঝোঁকটা কেটে যেতে সে নিজের স্ত্রী উমাকে চিনতে পারলো। তার হৃৎপিণ্ডটা একবার লাফিয়ে উঠেই থেমে যেতে চাইল, কারণ সে শুনল উমা বলছে—'ভাঁ—ঘ—ভাঁ—ঘ—একটা বাচ্চা।' উমার দুটো ঠোঁটের পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে স্রোতের মতো। কপালটা হয়তো মুছেছে উমা, সিঁদুরে কপালটা ভর্তি।

প্রথমে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই সে খানিকটা পেছনে সরে

গেল। তার শরীরের ধাক্কা খেয়ে পাশে শুয়ে থাকা সাত বছরের স্বপন কঁকিয়ে উঠলো। অতিকষ্টে হাত-পায়ের কাঁপুনি থামাতে চেষ্টা করতে করতে হিরণ্ময় দেখল স্বপন জেগে উঠে বিস্মিত চোখে তার মাকে দেখছে।

কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শের মতো ভয়কে অনুভব করে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা করল। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'কি হয়েছে?'

উমার হাতে ধরা মশারীটা থরথর করে কাঁপছে। মশারীটা টান হয়ে আছে, হয়ত' এক্ষুনি ছিঁড়ে পড়বে। দু'চোখ বেয়ে তেলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে জল নামছে, সমস্ত মুখটা চামড়া ছাড়ানো মাংসের মতো অস্বাভাবিক লাল। দুটো কষ বেয়ে লালা পড়ছে। দু'পাটি দাঁতে খট্‌খট্‌ শব্দ, এড়িয়ে যাওয়া জিভ আর গলার মোটা বিশ্রী আওয়াজ মেশিন চালানোর শব্দের মতো একটা অস্বাভাবিক ধ্বনি তরঙ্গ তুলছে।

হয় উমা পাগল হয়ে গেছে, নয়ত, কোনো গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। হিরণ্ময় শুনেছিল উমার বড়মার মাথা খারাপ হয়েছিল বেশী বয়সে। সে কথাটা হঠাৎ মনে হয়ে যাওয়াতে আরো ঠাণ্ডা আরো স্থির হয়ে গেল হিরণ্ময়। স্বপনের দুটো হাত হিরণ্ময়ের গলা জড়িয়ে ধরল অস্বাভাবিক জোরে।

চিৎকার করে সব শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে কেঁদে উঠলো স্বপন।

কান্নার শব্দ হিরণ্ময়কে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে দিল। সামনের পাশ-বালিশটাকে লাথি মেরে সরিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো হিরণ্ময়। উমার একটা হাত চেপে ধরল। চাপা সুরে বলল,—'কি হয়েছে? কি হয়েছে? কি হয়েছে? উমা? উমা? উমা?'

উমা কথা বললো না। আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল। দুটো অস্বাভাবিক ডিমের মতো বড় চোখ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। উপুড় হয়ে হিরণ্ময়ের পায়ের কাছে মাথা রাখল উমা। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

স্বপন হিরণ্ময়ের ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়েছিল। ওর কান্নার শব্দে হিরণ্ময়ের নিজের মাথাটাই কেমন ধোঁয়াটে হয়ে যেতে লাগল।

দাঁতে দাঁত চেপে সে উমাকে দু'হাতে ধরে সোজা করল। তারপর যেন এক্ষুনি উমাকে মেরে ফেলবে এই রকম ভাবে ঝাঁকি দিল। ঝাঁকি দিতে লাগল। উমার অবশ মাথাটা সামনে পিছনে অসহায় ভাবে লট্‌কে লট্‌কে পড়ল। তারপর অতিকষ্টে স্খলিত কণ্ঠে সে বলতে পারল,—'ভাঁড়ার ঘরে একটা বাচ্চা।'

—'কার বাচ্চা?' হিরণ্ময় হাঁটু গেড়ে উঠে বসলো।

—'জানি না বাচ্চাটা মরা।' আরো অশ্রুত কণ্ঠে বলল উমা।

—'কতটুকু বাচ্চা? মানুষের?' হিরণ্ময়ের ইচ্ছে হ'ল নিজের কপাল চাপড়ায়।—'জানি না, জানি না, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।' উমা আবার উপুড় হয়ে পড়ল।

প্রথমে হিরণ্ময়—হিরণ্ময় নামক নিরীহ ব্যক্তিটি কিছুই ভাবতে পারল না। কেন না আজ পর্যন্ত সকালে ঘুম থেকে উঠে সে সাধারণত চা খায় এবং চা খেয়ে আবার ঘুমোয়। ঘুম থেকে শেষ পর্যন্ত উঠে সে স্নান করে ভাত খেয়ে অফিসে যায়। এ রকম নিরীহ জীবনে ভয়ংকর কিছু ঘটতে পারে বলে তার ধারণা ছিল না।

খুব অস্বাভাবিক ভাবে স্বভাববশত হিরণ্ময় বালিশের [illegible]া থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট মুখে [illegible]তে গিয়ে হাত কেঁপে নাকের গর্তে ঢোকালো এবং খানিকটা [illegible]হয়ে অবশেষে ঠোঁটে চেপে ধরে দেশলাইটা খুঁজতে লাগল। [illegible]জকার মতোই দেশলাইটা হিরণ্ময় কোথায় রেখেছে মনে না [illegible]তে পেরে খুঁজে পেলো না। অভ্যাস মতোই সে উমাকে জিজ্ঞেস [illegible]—'দেশলাইটা?' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সে দেখলো উমা [illegible]কটুও নড়ছে না এবং সে ভাবলো খুব সম্ভবত এখনো সে [illegible]চ্ছে এবং ঘুমোতে ঘুমোতে বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।

এই ভাবে সে নিজের গায়ে চিমটি কাটলো, উমার চুল ধরে টানলো এবং স্বপনকে ঘুঁসি মারবে না চড় মারবে তা ভাবতে লাগল।

অবশেষে হিরণ্ময় নিশ্চিন্ত হ'ল যে সে জেগে আছে। সে আস্তে আস্তে উমাকে ঠেলল। উমা মুখ তুলল। হিরণ্ময় বলল,—'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে উমা বলল,—'আমি জানি না, আমি কিছু জানি না। তুমি যা হোক কিছু করো।' উমা অধৈর্যভাবে পা ছুঁড়ল। জল রাখার ছোট টুলটা শব্দ করে উল্টে পড়ল। ঝনাৎ করে কাঁচের গ্লাসটা চৌচির হয়ে ফাটল, ছোট ছোট কাচের টুকরোগুলো টুং টাং করে শানের ওপর ছড়িয়ে গেল। স্বপন চুপ করে শব্দটা শুনলো। উমা মুখ তুলল। দেশলাই-খুঁজে-না-পাওয়া হিরণ্ময় চিন্তিত ভাবে তার লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে খাট থেকে নামল। তার হাত পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হয়েছিল। ভয়টাও নেই। হিরণ্ময় অনুভব করল একটা তীব্র বিস্ময় ছাড়া তার মনে আর কিছু নেই।

লুঙ্গিটাকে ঠিকমতো পরল হিরণ্ময় তারপর উমার দিকে করুণ চোখে তাকাল। উমার পিঠে একটা হাত রেখে বলল,—'চল, দেখি ব্যাপারটা কি।'

উমা সর্বশরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল,—অসম্ভব আমি পারব না। আমি কক্ষনো ও ঘরে আর যেতে পারব না তুমি যাও।'

হিরণ্ময়ের নিজের মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। সে কিছু ভেবে স্থির করতে না পেরে উমার মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে শুধু বলতে পারল,—প্লীজ প্লীজ উমা, এখন পাগলামী করার সময় নয় ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে দাও।'

উমা মুখ তুলল। ওর গাল চোখের জলে ভিজে চক্‌চক্ করছে ঠোঁটের কষে লালার দাগ, সিঁদুরে মাখামাখি কপাল আর অস্বাভাবিক সাদা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময় দুঃখ পেে

লাগল।

হিরণ্ময় আর কিছু বলতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের আবছা জিনিষগুলোকে দেখে যেতে লাগল। কিছুই তার কাছে বোধগম্য মনে হল না। আলনায় শাড়ি, কাপড়, শায়া, ব্লাউজ জামা, টেবিলের ওপর কাগজের থাক, বই পেন, চশমার খাপ, টুথব্রাশের প্যাকেট, র‍্যাকে ঝোলানো পাঞ্জাবী, বেলেমাটির কুঁজো—এ সবের ওপর তার অনির্দিষ্ট দৃষ্টি পাথরের চোখের মতো নিরর্থক ঘুরতে লাগল।

উমা আস্তে আস্তে উঠল। কেউ কোনো কথা বলল না। হিরণ্ময় টেবিলের ওপর থেকে চশমাটা তুলে নিল।

তারা দুজন, আগে উমা পিছনে হিরণ্ময় দরজার কাছে এল। ধড়মড় করে উঠে বসে স্বপন বলে—'বাবা আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে।'

চমকে উঠে দু'জনেই ফিরল। উমা স্থির হয়ে রইল। হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি খাটের কাছে হেঁটে আসতে গিয়ে কাচের টুকরো আর জলের ওপর পিছলে পড়তে গিয়ে সামলে নিল। পা'টা কেটে গেল কিনা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। মশারীর কাছে নীচু হয়ে বলল, —'না বাপি, তুমি চুপ করে থাকো। নড়বে না, কথা বলবে না। মনে রেখো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটেছে।' বইয়ের পড়া গদ্যের মতো কথা বললো হিরণ্ময়।

—'ওকে আবার ওসব বলছো কেন!' উমা সচেতন হয়ে বলে। স্বপন কাঁদল,—'আমি যাবো-ও।'

হিরণ্ময় বলল,—'না।'

—'আমি যাবো।'

—'না।'

—'বাপি, আমি এক্ষুনি আসছি।' উমা বলে, তার গলার স্বরটা ভেজা ভেজা—'একটু চুপ করে থাকো। আমি এক্ষুনি এসে পড়বো।'

স্বপন স্তিমিত গলায় কি বললো হিরণ্ময় না শুনে দরজার কাছে সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে এল।

ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে এসে উমা বলল,—'তুমি যাও।'

—'আমি? হিরণ্ময় একটু দাঁড়িয়ে রইল। রঙ্গমঞ্চের পট খোলার আগে দর্শকের যেমন বুকচাপা প্রতীক্ষা। হিরণ্ময় একটু একটু করে চৌকাঠ ডিঙোলো। তারপর ক্রমে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

ছোট লম্বাটে ঘর। বাঁ ধারে সবুজ রঙের বড় কাঠের বাক্স, তার ওপর থাকে থাকে কাগজের প্যাকিং বাক্স। ওতে চীনেমাটির বাসন থাকে। ওপাশে জানালার নীচে দেওয়ালে পিঠ দেওয়া ঠাকুরের কাঠের সিংহাসন। সিংহাসনের ওপর রঙীন কাপড় চাপা হয়ে কালীঘাটের পট আর পেতলের গোপাল ঘুমোচ্ছে। ডান ধারে মেঝের ওপর সাজিয়ে রাখা ষ্টোভ, চায়ের কেটলী চিনির কৌটো।

হিরণ্ময় তার চোখ দুটোকে এক পলকে চারদিকে ঘুরিয়ে আনল। তার নিঃশ্বাস দ্রুত হ'ল। তারপর অবশেষে সে দেখতে পেলো। কাঠের ছোট প্যাকিং বাক্সটার ওপর ময়লা টুকরো টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে জড়ানো ছোট একটা দেহ। এত ছোটো যে হিরণ্ময়ের মনে হ'ল তার হাতের চেটো প্রসারিত করলে দেহটার মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাপতে পারবে। সমস্ত দেহটা ঢাকা শুধু ছোট্ট রবারের বলের মতো মাথাটা বেরিয়ে আছে। চোখ দুটো বোঁজা।

হিরণ্ময় প্রথমে চোখ বুঁজে স্থির হয়ে রইল। দ্রুত নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর ছোট দেহটার কথা ভাবলো। তারপর হয়তো দেহটার ক্ষুদ্রত্ব তার মনে কিছুটা সাহস দিল। সে চোখ মেলে একটু হাসতে চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে সে বোধহয় দেহের অনিত্যতা সম্পর্কে কিছু ভাবতে চাইছিল।

বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ তুলে উমা দৌড়ে গিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল। ঝনাৎ করে দরজা বন্ধ করার শব্দ পায় হিরণ্ময়। একটা অস্পষ্ট ক্রোধ তার মনে পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

দূর থেকে সে দেহটাকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল। দেখতে দেখতে সে স্থির হয়ে যেতে লাগল। তারপর সে অনুভব করল আস্তে আস্তে আলো ফুটছে ভোরের। শহরতলীর মানুষরা জেগে উঠেছে। সে কাশির শব্দ পেলো, খড়মের খট্ খট্ আওয়াজ পেলো। ঘটি থেকে জল ঢালবার শব্দ শুনল। এ পাশের ও পাশের বাড়ীর লোকেরা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে।

একটা গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভোরের বাতাসের ওপর যেন ভারী গম্ভীর হাতুড়ির ঘায়ের মত আঘাত করছে।

স্থির হিরণ্ময় নিজের হাত মুঠো করে আবার খোলে, আবার মুঠো করে।

হিরণ্ময় চলে যেতে পারল না। সে অস্থির হয়ে প্যাকিং বাক্সটার কাছে এসে দাঁড়ালো। কম্পিত হাতটা প্রসারিত করে সরিয়ে নেয়। নিজেকে কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিয়ে আস্তে আস্তে সে ছোট শীর্ণ দেহটার ওপর থেকে ঢাকাটা সরিয়ে নিতে থাকে। প্রতিবার আর্শোলার খড় খড় শব্দ কিংবা ইঁদুরের কিচিরমিচিরের সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা কাঁপতে থাকে। নিষিদ্ধ অশুচি কোনো কাজ করার মতো একটা সংকোচ, একটু ঘেন্না হতে লাগল হিরণ্ময়ের। ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলো, উমার পায়ের শব্দ।

সকালের প্রথম রোদ দেওয়ালে রক্তের স্রোতের মতো প্রতিহত হ'ল। উমার পায়ে শব্দটা সেই মুহূর্তে দরজায় থামল। হিরণ্ময়ের চোখের সামনে সেই শীর্ণ মৃত শিশুর গলায় বাসি ফুলের মালার দাগের মতো অস্পষ্ট গাঢ় রঙের কয়েকটি দাগ স্পষ্ট হ'ল।

॥ তিন ॥

এটা উমার ঠাকুর ঘর। হিরণ্ময় নিজের বাসার ছকটা ভেবে নিতে চাইল। ঠাকুর ঘরের ওপাশে রাস্তা। তাতে এখন লোক চলাচল শুরু হয়েছে। এ পাশে ছোট্ট একটু বারান্দা তারপর শোওয়ার ঘর। ও পাশে একটু উঠোনের মতো, কোণের দিকে বাথরুম ইত্যাদি। চারদিকে উঠোন উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তিনদিকে বাড়ি। যে এসেছিল সে কি করে এসেছিল তা হিরণ্ময় খুঁজতে লাগল। উঠোনে নেমে সে দ্রুত পিছনের খিড়কির দরজার কাছে এলো। দরজাটা বন্ধ। ভিতর থেকে খিল তোলা। চারদিকে দু'মানুষ সমান উঁচু দেওয়াল।

হিরণ্ময় হতাশ ভাবে চারিদিকে তাকায়। বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে উমা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। যেন উমা আশা করছে হিরণ্ময় এক্ষুনি সব সমস্যার সমাধান কোন অচিন্তনীয় উপায়ে করে ফেলবে। চারিদিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ের একটা আশা হতে লাগল। ক্রমে সেই আশা বিশ্বাসে পরিণত হ'ল। তার বিশ্বাস হ'ল যে কেউ তাদের সঙ্গে একটা মর্মান্তিক রসিকতা করেছে। সেই ব্যক্তিটি ভোরেই খুব অনুতপ্ত হবে এবং এসে বলবে—'ভাই হিরণ্ময় ওটা রবারের পুতুল। আমি শুধু একটু ঠাট্টা করছিলুম। কিছু মনে কোরো না।' হিরণ্ময়ের ভোরের আলোয় তার ডান হাতের দুটো আঙ্গুল দেখছিল। দুটো আঙ্গুল দিয়ে সে বাচ্চাটার গালে স্পর্শ করেছিল। আঙ্গুল দুটো একটু শির শির করল। বাচ্চার গলাটা রবারের মতো ছিল কিনা হিরণ্ময় মনে করতে পারল না।

—'ও কি এখন ওখানেই থাকবে?' উমা কান্না ভেজা গলায় বলে।

—'কে? কার কথা বলছো?' হিরণ্ময় অন্যমনস্ক।

—'যে ভাঁড়ার ঘরে আছে!' উমা জবাব দিল। হিরণ্ময় ভাব

উমা কোনো জীবিত মানুষের কথা বলছে। হিরণ্ময় একটু কাঁপে। উমা কি অদ্ভুত ভাবে কথা বলে! হিরণ্ময় গলা চুলকোলো। তারপর শূন্য গলায় স্বগতোক্তির মতো বলল,—'আমি কি করব? আমি কি করতে পারি?

—'পুলিশে খবর দাও। সবাই জানুক।' উমা ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে সংযত করতে চাইল। এখনো সে মাঝে মাঝে ফোঁপাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে এখনো। কি করতে হবে হিরণ্ময় সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে না। প্রত্যহের কিছু কিছু ঘটনাকে সে চেনে জানে। সেগুলো অভ্যাসবশত আপনা থেকেই ঘটে যায়। সে জন্যে ভাবতে হয় না। সত্যিকথা স্বীকার করতে হিরণ্ময়ের বাধা নেই যে, আজ পর্যন্ত মৌলিক চিন্তার প্রয়োজন হয় এমন কাজ সে খুব কমই করেছে।

পুলিশের কথা ভাবতে গিয়ে হিরণ্ময় অস্বস্তি বোধ করে। আজ পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ হয়নি। এমন কি কি-ভাবে এসব ক্ষেত্রে পুলিশে খবর দিতে হয় হিরণ্ময় তাও জানে না। এ ছাড়া যে এ কাজ করেছে সে নিশ্চয়ই হিরণ্ময়ের কোনো জঘন্যতম শত্রু। সে উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করেছে। সে নিশ্চয়ই জানে যে হিরণ্ময় পুলিশে খবর দেবে এবং তারপর কি ঘটবে তা আন্দাজ করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। হিরণ্ময় সতর্ক হয়ে বলল,—'এ নিয়ে হৈ চৈ করা বোধহয় ঠিক নয়, ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে দাও। এখন কাউকে জানতে দিও না। এর পেছনে উদ্দেশ্য আছে।'

—'তবে এই জঘন্য ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কি করব।' হতাশায় ভেঙে পড়ে আবার কাঁদতে সুরু করে উমা। হিরণ্ময় টের পেল তার ওপর উমার নির্ভরশীলতা কম। হিরণ্ময় শক্ত হয়ে উমার কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রাখল। সে দ্রুত চিন্তা করছিল। এক্ষুনি ঠিকে ঝি আসবে, খবরের কাগজওলা আসবে, গয়লা আসবে, স্বপনের মাষ্টারমশাই আসবে। একের পর এক

আসবে, না, একসঙ্গে সবাই আসবে সেটাই ভাবছিল হিরণ্ময়।

—'শোনো'—হিরণ্ময় বলল,—'এটা ভেঙে পড়বার সময় নয়।'

—'আমি কি করব'—উমা তার লাল, জলভরা ফোলা চোখ তুলল।

সদর দরজার কড়ার শব্দ হ'ল কড়কড় করে। দু'জনেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেঁপে উঠল। তারপর উমার হাত ধরলো হিরণ্ময়। উমা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, —'মঙ্গলা!'

—'শোনো'—প্রায় স্খলিত কণ্ঠে হিরণ্ময় বলল,—'ওটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। কেউ যেন দেখতে না পায়।'

—'এক্ষুনি মঙ্গলা এসে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকবে।' কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে বলে উমা।

নিজের শরীরেও একটা কাঁপুনি অনুভব করে হিরণ্ময়। নিজের গলার স্বরটা বিকৃত শোনায়। বলে,—'তুমি স্বপনকে নিয়ে কলতলায় চলে যাও। সদর দরজা খুলো না। আমি সেই ফাঁকে শোবার ঘরে খাটের নীচে ওটাকে রাখব।'

কড়কড় কড়াৎ করে কড়ার শব্দ হচ্ছে। মঙ্গলা ডাকছে,—'ওমা' মাগো, দোরটা খুলে দাও। আমার তো অন্য বাড়িতে কাজ আছে বাছা!'

পাছে স্বপন উঠে দরজা খুলে দেয় এই ভয়ে উমা তাড়াতাড়ি উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দ্রুত পায়ে ঘরে গেল। হিরণ্ময় আস্তে আস্তে অবশ শরীরটা নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল। ঢুকে দরজা বন্ধ করে বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

আলোকিত ঘরটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে প্যাকিং বাক্সটার ওপর থেকে ছোট্ট নরম পাঁউরুটির মতো বাচ্চাটাকে তুলে নিল। ন্যাকড়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ল। শুধু একটা ন্যাকড়া ছোট্ট ফুলে থাকা পেটটার ওপর রক্তে ভিজে লেগে রইল। ওর নাভিটা ভালভাবে কাটা হয়নি। হিরণ্ময় দেখল। রক্তগুলো জমাট বেঁধে পেটের ওপর মাথার পাশে, কানের পেছনে

শুকনো রঙের মতো লেগে আছে। ছোট্ট বলের মতো মাথাটা হিরণ্ময়ের হাতের তেলো থেকে অবোধভাবে ঝুলছে। হিরণ্ময়ের হাতটা ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে। তার মনে হ'ল মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখুনি মেঝের ওপর পড়ে ফটাস করে ফেটে যাবে। তারপর খুলির টুকরোগুলো কাচের টুকরোর মতো শানের ওপর টুং টাং করে ছড়িয়ে যাবে আর তক্ষুনি প্রতিবেশীরা এখানে জমায়েৎ হবে দরজার সামনে।

কাঁপতে কাঁপতে হিরণ্ময় বসে পড়ে। ন্যাকড়াগুলো তুলে ঢেকে দিতে থাকে শরীরটা। তার অনভ্যস্ত হাতে কাজটা ভালভাবে হয় না। কাঁপা কাঁপা হাত থেকে ন্যাকড়াগুলো ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দাঁতে দাঁত চাপে হিরণ্ময়। নিজের ওপর অকারণে রাগ হতে থাকে।

উমার হাত ধরে চলতে চলতে স্বপন ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়,—'কি হয়েছে মা?'

—'কিছু না।' ছেলেকে টেনে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে নিতে নিতে উমা বলে।

—'তা হলে বাবা কোথায়?'

—'বাথরুমে গেছে। তুমি এসো শীগগীর।'

দু'জনের পায়ের শব্দ শুনতে পায় হিরণ্ময়। ওরা কলতলার দিকে চলে গেল। ছোট দেহটাকে মেঝের ওপর রেখে ন্যাকড়াগুলো দিয়ে প্যাকেটের মতো জড়ায় হিরণ্ময়। ছোট্ট কোঁচকানো বলের মতো মুখটা ঢেকে দেয়। ওর চোখদুটো বোঁজা, কপাল কোঁচকানো হাত দুটো মুঠো করা। গম্ভীর দার্শনিকের মতো চোখ বুজে বাচ্চাটা যেন ভাবছে। নাড়া দিলে এক্ষুনি চোখ খুলে তাকিয়ে হাসবে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে রোমাঞ্চিত হয় হিরণ্ময়। বাচ্চাটাকে অস্বাভাবিক জোরে বুকে চেপে ধরে দরজাটা খুলে ফেলে। শোওয়ার ঘরে ঢোকে।

কড় কড় কড়াৎ করে কড়া নড়ছে। বোধহয় এতক্ষণে রাস্তার

লোক জমে গেছে মঙ্গলার কান্ড দেখে।

দ্রুত নিজের শরীর বেঁকিয়ে খাটের নীচে বাচ্চাটাকে মেঝের ওপর রাখে। তারপর যতদূর হাত যায় ঠেলে ঠেলে ভিতরের অন্ধকারে সরিয়ে দেয় প্যাকেটটাকে। সতর্ক চোখ দিয়ে দেখে বাইরে থেকে দেখা যায় কিনা। তারপর তোষকের তলা থেকে সতরঞ্চিটা টেনে টেনে পর্দার মতো ঝুলিয়ে দিতে থাকে হিরণ্ময়। তার ফলে সমস্ত বিছানাটাই কুঁচকে যেতে থাকে, মশারীটা হেলে নীচু হয়, তোষক ঝুলে পড়ে এবং ধপাস করে পাশ বালিশটা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে। চমকে উঠে দাঁড়ায় হিরণ্ময়। পাশ বালিশটা হাতে তুলে নিয়ে ভাবে আর কি করা যায়। মশারী তুলে বালিশটা বিছানায় ছুঁড়ে দেয় তারপর লুঙ্গিতে ঘষে ঘষে হাতটা মুছতে থাকে।

উমাকে কি যেন বলতে বলতে স্বপন ঘরে ঢুকে বাবার দিকে তাকিয়ে থমকে যায়। স্বপন লক্ষ্য করল তার বাবা মাকে চোখ দিয়ে ইশারা করে দরজাটা দেখাল তারপর বিছানাটায় হাত রাখল। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে হিরণ্ময় বলল,—'চল বাপি, আমরা উঠোনের রোদে দাঁড়াই।' স্বপনকে নিয়ে হিরণ্ময় বেরিয়ে গেল।

উমা সদর দরজা খুলে দিল।

উমাকে দেখে এক পা পিছিয়ে গেল মঙ্গলা,—'কি হয়েছে গো মা? চোখ মুখ অমন ফ্যাকাসে কেন গো? আমি ভাবনু বুঝি ঘুমোচ্ছো, তাই—'

উমা টের পায় দরজার পাল্লায় তার হাতটা থরথর করছে যেন এক্ষুনি ঝুলে পড়বে। মঙ্গলার পেছনে সদর রাস্তায় দু'একজন লোক হাঁটতে হাঁটতে তাকিয়ে দেখে গেল। প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল উমা,—'কিছু হয়নি। তুমি ভেতরে এসো।'

কেমন যেন সন্দেহের ছায়া নামল মঙ্গলার মুখে। চোখটা ঘুরিয়ে মুখ বেঁকিয়ে একটু হাসল, 'তাই বুঝি? আমি ভাবলাম

ক বুঝি হ'ল—'

—'কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি ভেতরে এসো।'
যায় ধমকে উঠলো উমা। নিজের চোখ মুখকে স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করল। হাত জোরে চেপে কাঁপুনি থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। অনুভব করল জিভটা কাঁপছে। এক্ষুনি আবার দাঁতে দাঁতে ক্‌ঠক্‌ শুরু হয়ে যাবে।

—'যাচ্ছি গো। ভেতরে যাওয়ার জন্যেই তো ডাকাডাকি করছি কোন সকাল থেকে। কেউ দোর খুললো না—আবার দত্তবাড়ির গিন্নী তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে'—কথা শেষ না করে মঙ্গলা সিঁড়িতে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা নীচু হয়ে তুলে নিল। তার-পর উমার পাশ ঘেঁষে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে ঘরের ভেতর এল।

—'এ কি গো বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছিল? টুল ওল্টানো, গ্লাস ভাঙা, বিছানাপত্র তুলকালাম—

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো উমা। অতিরিক্ত গম্ভীর বিকৃত স্বরে বলল,—'মঙ্গলা, তুমি ভিতরে যাও।'

মঙ্গলা দুটো গোল চোখ নিয়ে উমাকে দেখছে,—'ওকি সদর বন্ধ করলে যে? ঘরে ঝাঁট পাট দিতে হবে না, বিছানাপত্র গোছাতে হবে না? তোমার আজ কেমন কাণ্ড গো? জানলাগুলোও তো খোলোনি দেখছি।

জানালা খোলার জন্য মঙ্গলা এগোচ্ছিল। প্রায় চীৎকার করে ধমক দিল উমা,—'তোমাকে কিছু করতে হবে না—আ। তুমি বাইরে যাও।'

মঙ্গলা থমকে দাঁড়ায়। বিড়বিড় করে কি যেন বলে। তারপর ফিরে উঠোনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। উমা শুনতে পায় মঙ্গলা বারান্দা দিয়ে কলতলায় এঁটো বাসনপত্রগুলোর কাছে যেতে যেতে বলছে,—'কে জানে বাপু কি নিয়ে ঝগড়া। সকালেই কুরু-ক্ষেত্তর বেধে গেল—'

উমা আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে থাকল। সমস্ত ঘরটায়

ময়লা জামাকাপড়, বন্ধ-বাতাস আর জলে ভেজা মেঝের সোঁদা গন্ধ। ঘরটা এখনো অন্ধকার। জানলা খুলে দিলে আলো বাতাস আসবে। কিন্তু আজ আর আলো বাতাসের প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর আলো বাতাস যেন কে তার চোখ মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল।

এখন কি করবে উমা? কি করতে পারে? সত্যিই তো আর ঘরটাকে এমনিভাবে সারাদিন রাখা যাবে না। মঙ্গলা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবে তারপর দত্তবাড়ীতে বলবে, মুখুজ্জে বাড়ীতে বলবে। কল্পনা করতেও গায়ে কাঁটা দিল উমার। এই একটা ছাড়া আর ঘর নেই। একটু পরে স্বপনের মাষ্টার-মশাই এসে এ ঘরে বসবে। ঘর ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। আর সারাদিন ধরে একটা ছোট্ট শিশুর দেহ খাটের তলায় অন্ধকারে ধুলোর মধ্যে পচবে। সকলের চোখের সামনে ইঁদুরগুলো দৌড়োদৌড়ি করবে ওর মাংস মুখে নিয়ে।

আবার কড়া নাড়ল। এবার দুধওয়ালা।

উমার মাথাটা আবার কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে লাগল। বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে। চোখের ওপর একটা গোলাপী আভা, মাথার ভেতরে হাতুড়ী পিটছে কেউ। উমা হাত বাড়িয়ে খাটের বাজুটা ধরতে গিয়ে টলতে থাকে।

স্বপনকে বারান্দায় বসিয়ে হিরণ্ময় ঘরে এল। এসে দেখল মশারীর কণা ছিঁড়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে উমা। শাড়ীটা কোমরের কাছে আলগা। কাঁধে আঁচল নেই।

দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ। স্বপন কখন উঠে এসে ভেতরের দরজার চৌকাঠের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

হিরণ্ময় ভয় পেয়ে গেল। উমার পিঠে হাত রেখে বলল,— 'এটা কাঁদবার সময় নয় ওঠো, শাড়ীটা ঠিক করে নাও।'

—'বাইরে দুধওলা ডাকছে।

আমি কি করব?

—'আমি দুধ নিচ্ছি, ও বাইরে থেকেই চলে যাবে তুমি ঠিক হও। শক্ত হও। ঘর ছেড়ে নড়বে না।'

হিরণ্ময় অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচীটা বাড়িয়ে বাইরে থেকে দুধ নিয়ে ঘরে এল। দরজা বন্ধ করে দেখল উমা আস্তে আস্তে মশারীর কোণাটা টাঙিয়েছে। মশারীর ঘেরটা তুলে দিয়েছে চালের ওপর। তাতে ঘরটাকে কিছুটা বড় আর পরিচ্ছন্ন মনে হয় হিরণ্ময়ের। খাটের কোণায় বসে বাজুর ওপর হাত রেখে মাথা চেপে চুপ করে বসে আছে উমা। সম্ভবত উমা কিছু ভাবছে। খুব সাবধানে শক্ত করে ডেকচীটা ধরে, যেন এই ডেকচীটার ওপর তার জীবন নির্ভর করছে এমনি ভাবে হিরণ্ময় বারান্দায় এল। স্বপন মাথা ঘুরিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার বাবাকে দেখতে লাগল। সে ইতিপূর্বে দুধের ডেকচী হাতে তার বাবাকে কখনো দেখেনি।

উমা আস্তে আস্তে বিছানার চাদরটা টান করল, বালিশগুলোকে গুছিয়ে রাখল। সে তোষকটা বা শতরঞ্চিটা ঠিক করবার চেষ্টা করল না। সতরঞ্চিটা তেমনি ঝুলতে থাকল পর্দার মতো। খুব সাবধানে উমা রাস্তার দিকের জানালার একটা পাট খুলল। একটু নিঃশ্বাস নিল তারপর আবার জানালাটা বন্ধ করে দিল।

॥ চার ॥

হিরণ্ময় বারান্দা থেকে দেখল মঙ্গলা মাজা বাসনের পাঁজা ভাঁড়ার ঘরের দরজায় রেখে ফুল-ঝাঁটা তুলে নিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকছে। হিরণ্ময় দ্রুতপায়ে মঙ্গলার পিছনে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল।

সেই সময়ে আবার কড়া নড়ল কড়কড় কড়াৎ। উমা চমকে মঙ্গলার দিকে তাকাল। হিরণ্ময়কে দেখল। হিরণ্ময় চুপ। উমা খাটের বার বাজুটা ধরে ভেঙে পড়তে থাকে। মঙ্গলা ঝাঁটাটা মাটিতে রেখে দরজা খোলার জন্য তৈরী হয়।

আচম্বিতে চেতনা ফেরে হিরণ্ময়ের। প্রায় লাফিয়ে ধাক্কা দিয়ে মঙ্গলাকে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা আটকে দাঁড়ায়,—'তুমি এখানে কি চাও? চলে যাও এখান থেকে।' এই বলে খিল খুলে হিরণ্ময় দরজাটা সামান্য ফাঁক করল।

বুড়ো মাষ্টারমশাই তাঁর চশমাটা খুলে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসল। তারপর নিজেই দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে চাইল। হিরণ্ময় শক্ত ইঁটের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এতটুকু নড়লো না। বললো,—'স্বপনের আজ অসুখ।' সে মাষ্টারমশাইয়ের মুখটা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখল।

—'সে কি গো?'—মঙ্গলা হিরণ্ময়ের প্রায় ঘাড়ের কাছে চেঁচাল,—'দাদাবাবু তো—'

—'এই-ই'—একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার দিয়ে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে উমা,—'তুমি গেলে এই ঘর থেকে! পাজী, ছুঁচো, বেরোও।' ঝপাস্ করে ঝাঁটা ফেলে কাঁপতে কাঁপতে মঙ্গলা গেল। উমার দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। মাষ্টারমশাই চমকে উঠলো উমার গলার শব্দে।

—'অসুখ? কি অসুখ?' মাষ্টারমশাই চশমাটা খুললো। হিরণ্ময় কি বলতে চাইছিল তা গুলিয়ে গেল। সে নিজেই বুঝতে

পারল না সে কি বলছে। নিজের অদ্ভুত মোটা গলার বিকৃত আওয়াজ তার কানে গেল। মাষ্টারমশাই চশমাটা মুছে চোখে পরে খুব বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকালো। হিরণ্ময় শুনতে পেলো অনেকগুলো অনুসর্গ অব্যয় মিলিয়ে সে যা বলছে তা অনেকটা তার স্বপ্নে উমার মুখে শোনা সেই অদ্ভুত ভাষার মতো। মাষ্টার-মশাই দরজাটা আর একবার ঠেলবার চেষ্টা করে বলল,—আমি ওকে একটু দেখতে পারি ?'

—'কাকে ?' প্রায় চীৎকার করে উঠল হিরণ্ময়।

'তুমি চলে এসো। দরজাটা বন্ধ করে দাও'—হিরণ্ময়ের হাত ধরে টানতে টানতে উমা বলে।

ততক্ষণে স্বপন ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। উমা দৌড়ে স্বপনকে জড়িয়ে ধরল। তার মুখে হাত চাপা দিল।

—'তবে'—মাষ্টারমশাই বলল,—আচ্ছা তা হলে'—মাষ্টার-মশাই আস্তে আস্তে পেছলো। খুব চিন্তিত দেখাল মাষ্টারমশাইকে।

দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে হিরণ্ময় পিছনে সরে এল। সে দেখল চৌকাঠের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে উমা স্বপনকে বুকে জড়িয়ে আছে। উমা বলছে,—'আজ তুমি তাড়াতাড়ি স্কুলে যাবে। আজ ভাত হবে না, দুধ-মুড়ি খেয়ে যেও, ফিরে এসে ভাত খাবে। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে ইস্কুলে, কেমন ? সোজা বাড়ী ফিরবে, হুঁ ?'

খুব ঠাণ্ডা বিস্মিত চোখে স্বপন তার দিকে দেখল। কোন কথা বলল না। হিরণ্ময় অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। স্বপন উমার কাছ থেকে সরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে খাটের কাছে এগিয়ে যেতে থাকে।

—'স্বপন !' হিরণ্ময় চেঁচাল। স্বপন ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল,—'আমার খেলনার বাক্সটা খাটের তলায় আছে।

হিরণ্ময় ধমকে উঠল,—'কি করবে এখন তুমি খেলনার বাক্স নিয়ে ? লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, স্কুলের বেলা হতে চললো না ? স্বপন ঘুরে দাঁড়িয়ে কান্নার বেগ সামলে ঘর থেকে ঠোঁট ফুলিয়ে

বেরিয়ে গেল। উমা দুটো হাত কোলে রেখে অসহায়ের মতো চেয়ে রইল। কোণের চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে চোখ বুঁজল হিরণ্ময়। শুধু শুনল উমা বলছে,—'কে আমাদের এত বড় শত্রু—'

কে এ কাজ করতে পারে? হিরণ্ময় ভাবতে চেষ্টা করল। আর কেনই বা কেউ এ কাজ করবে? এটা যে তাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? সে জ্ঞানত কারোর শত্রুতা ইচ্ছে করে করেনি। শত্রুতাকে সে ছেলেবেলা থেকেই পাপ বলে জানে। অবশ্য পাপ সে দু'একটা করেছে। তবে ইচ্ছে না থাকলেও সকলেই দু'একটা পাপ করতে বাধ্য হয়। আসলে পাপ করতে চাইলেও করা যায় না। তার ছকে বাঁধা নিরীহ জীবনে কোথাও একটা গণ্ডী আছে তা পেরিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। সে ভেবে দেখল অন্য আর পাঁচজন মানুষের চেয়ে বেশী পাপ সে করে নি। শত্রু হিসেবে যে কয়েকজনের কথা মনে পড়ল তারাও ভয়ংকর রকমের প্রতিশোধ নিতে পারে বলে তার ধারণা হ'ল না। শত্রু হিসেবে সে কারো মুখ যে ভাবতেই পারল না। বরং স্বপনের বুড়ো মাষ্টারমশাইকে তার মনে পড়ল।

মাষ্টারমশায়ের কোঁচকানো, লালচে, প্রশস্ত কপালওলা মুখটায় সন্দেহের ছায়া দুলছে। মাষ্টারমশাই চিন্তিত, বিস্মিত। মাষ্টার-মশাইকে তার শত্রু বলে মনে হ'ল। একটু গভীরভাবে তলিয়ে সে দেখল যে আসলে এ রকম একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আজ যে কেউ আসবে তাকেই তার শত্রু বলে মনে হবে। যেন সবাই তাকে কিছুক্ষণ পাপের শাস্তি দিতে আসবে। আরো দু'একজনের মুখ তার মনে আবছা ভাবে মনে পড়ে। কিন্তু বিবেচনা করে দেখলে তার সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্র ছাড়া তারা সবাই নিরীহ এবং ছা-পোষা। সুতরাং অসহায় হিরণ্ময় ক্রুদ্ধ হয়ে মুঠো পাকালো।

চোখ চেয়ে হিরণ্ময় দেখল টেবিলের ওপর দেশলাইটা পড়ে আছে। সে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজতে উঠল। জামার পকেট

ড্রেসিং টেবিলে কোথাও খুঁজে না পেয়ে আবার হতাশ হয়েচেয়ারে বসল। তার মন তেতো হয়ে গেল। এ সব হঠাৎ ভুলে যাওয়া বা মনে না পড়ার ক্ষেত্রে সাধারণত সে উমার স্মরণশক্তির সাহায্য নিয়ে থাকে। কিন্তু এ সামান্য ব্যাপারে সে উমাকে আজ বিরক্ত করতে চায় না। তার মনে পড়ল যে উমা তাকে চা দেয়নি। মাথাটা সামান্য ধরেছে।

চোখ বুঁজে শুয়ে সে টের পেল স্বপন বারান্দায় বসে দুধ-মুড়ি খাচ্ছে। উমা তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। আর মঙ্গলা যাবার সময় স্বপনকে ইস্কুলে পেঁছে দিয়ে যাবে বলে ভিতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপনের ইস্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে, ওর ইস্কুল সাড়ে ন'টায়। তার নিজের অফিসে যাওয়ার সময়ও প্রায় হ'ল, কিন্তু সে আজ অফিসে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারল না। চোখ বুঁজে সে পাপের কথা ভাবতে লাগল।

পাপ সকলেই কিছু কিছু করে। সে নিজেও দু'একটা করেছে। সে রেণুর কাছে যেতো। সে ছেলেবেলায় শুনেছিল রেণুর মতো মেয়ে যারা, তাদের কাছে যাওয়া পাপ। বয়স হলে সেই পাপ রহস্যের মতো তাকে আকর্ষণ করেছিল। রেণু সেই রহস্য। রেণু সেই পাপ। রেণু মারা যাওয়ার পর সে পাপের স্বরূপ কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। অনেকদিন পর্যন্ত সে নিজের চামড়ায় ফুস্কুড়ি খুঁজেছিল। রেণুর জন্য তার দুঃখ হয়নি। উমা রেণুর দুঃখ তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, কেন না উমা রেণুর কথা জানতো না। হয়তো তার নিজের মতোই কেউ রেণুর মতো কারো কাছে গিয়েছিল। কারণ, রেণু রহস্য, এবং সে পাপ করতেই শুধু রেণুর কাছে যেতে পারে। এবং সেই পাপ নিঃশব্দে হিরণ্ময়কে লিপ্ত করতে অতীতের হিরণ্ময়ের মতো কেউ—কিংবা রেণুর মতো কেউ—অসম্ভব একটা চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে। সে ক্রমশঃ এই চাতুর্যের জালে—নির্বোধের মতো নিজেকে জড়াচ্ছে।

নিজের উত্তপ্ত মাথাটা নিয়ে হিরণ্ময় উঠে দাঁড়াল। সে ভাবল

সে যা করেছে তা অনুচিত। এতে ঢেকে রাখবার কিছু নেই। সে সোজা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে দারোগা, কিম্বা ইন্সপেক্টরকে—সে জানে না দারোগা এবং ইন্সপেক্টর একই ব্যক্তি কিনা,—বলবে যে এই ব্যাপার ঘটেছে। ব্যাপারটা যদিও অসম্ভব রকমের এবং তারা খুব অবাক হবে কিন্তু হিরণ্ময় ভাবল, তার অন্য কিছু করার নেই।

হিরণ্ময় আলনায় ঝোলানো শার্ট পেড়ে নিয়ে পরতে লাগল। আপন মনে বিড় বিড় করে কথা সাজাতে লাগল। কিন্তু তার পর হিরণ্ময়কে থামতে হ'ল একটা কথা মনে পড়ায় তার সমস্ত শরীরটাতে ভূমিকম্প হতে লাগল।

যদি কেউ আগেই পুলিশে খবর দিয়ে থাকে! যে এই অদ্ভুত কাজ করেছে সে নিশ্চয় হিরণ্ময়কে চেনে, তার বাড়ীতে ঢুকবার পথ জানে। হয়তো সে এখনো হিরণ্ময়কে লক্ষ্য করেছে। যদি সে ইচ্ছে করে তবে হিরণ্ময়কে যতদূর সম্ভব পাকে পাকে জড়াবে। ইচ্ছে করলে সে যে কোন গল্প বানিয়ে বলবে পুলিশকে, তার চরিত্র নিয়ে চাপা ইঙ্গিত করবে! তারপর ভারী বুটের আওয়াজ তুলে পুলিশ এসে বলবে 'আপনার বাড়ী আমরা সার্চ করতে চাই। আমাদের সন্দেহ হয় এ বাড়ীতে খুঁজলে একটা শিশুর দেহ পাওয়া যাবে।' অসহায়ের মতো হিরণ্ময় বসল। এ রকম অদ্ভুত চিন্তা হিরণ্ময় কখনো করেনি। সে হাত পা ছড়িয়ে দিল। তার সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করতে থাকে। সে ভাবল সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। স্বপন তার জুতোর শব্দ তুলে এ ঘরে এলো। একটু দাঁড়ালো। তার বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে মঙ্গলার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। তারপর উমা ঝপাৎ করে দরজা বন্ধ করে খিল তুলল! হিরণ্ময় কিছু দেখল না। চোখ বুঁজে রইল। তার চোখের সামনে ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট ঘরটা দুলতে থাকে। সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছে ভেবে নিজের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে হিরণ্ময়।

উমা দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—'তুমি ওঠো'—উমা বলে।

হিরণ্ময় চুপ করে থাকে।

—'শুনছো, ওঠো। মুখ হাত ধুয়ে নাও।'

হিরণ্ময় অর্থহীন চোখে তাকায়। তার কাছে এখন সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হতে থাকে। হয়ত সত্যিই খাটের তলায় কিছু নেই!' হয়ত' এখনো তার ঘুম ভাঙেনি। এই অসহ্য দুঃস্বপ্নের মতো কারণহীন ঘটনার কোনো সমাধান যেন কেউ কখনো করে দিতে পারবে না।

—'আমি কি করব? আমরা এখনো জানি না ওটা কার শয়তানী। আমরা কখনো কোন দিন জানবো না।' হিরণ্ময়ের গলা কাঁপতে থাকে। স্পষ্টই সে কান্না চেপে রাখতে পারছে না।

—তুমি ওঠো।' উমার গলায় দৃঢ়তার আভাষ পাওয়া যায়। তার দু'চোখের দৃষ্টি শান্ত, স্থির। সে বলে 'উঠে মুখ হাত ধুয়ে নাও।'

—'তারপর?' হিরণ্ময়ের গলায় হতাশা।

—'তারপর তুমি পুলিশের কাছে যাবে। সব বুঝিয়ে বলবে। আমরা এ ব্যাপারের জন্য দায়ী নই। কেউ আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, নিজে পাপ ঢাকতে চেয়েছে।' প্রায় কঠিন গলায় উমা বলে।

—'কিন্তু আইন আছে' পুলিশ আমাদের ছাড়বে কেন? মনে রেখো ওটা আমাদের ঘরে পাওয়া গেছে।

উমা ভেঙে পড়ল না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েও রইল না। হিরণ্ময় দেখল ওর সমস্ত শরীরটা নমনীয় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে। এ যেন রোজ দেখা উমা। ওর চোখ দুটো শান্ত স্থির কঠিন কি যেন ভেবে ও আবার শক্তি ফিরে পেয়েছে। হিরণ্ময় অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসতে চাইল। কি ভেবে কোন উপায়ে উমা স্বাভাবিক হয়ে যেতে পেরেছে তা জানতে খুব ইচ্ছে হল হিরণ্ময়ের।

উমা হিরণ্ময়ের সামনে দাঁড়িয়েও রইল না। এলোমেলো ঘরটাকে ত্রস্ত হাতে গুছিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে উমা। হিরণ্ময়ের

দিকে চাইছে না।

খানিকটা বিস্ময় নিয়ে উমাকে দেখতে লাগল হিরণ্ময়। যেন উমাকে দেখা ছাড়া আর গতি নেই। উমা নিজের শরীরটা বন্ধ ঘরের বাতাসের মধ্যে মাছের মতো স্বাভাবিক ভাবে খেলাচ্ছে। আলনাটা এলোমেলো! কাল বিকেলে হিরণ্ময় ফিরে এসে জামা কাপড়গুলো দ্রুত হাতে যে ভাবে ছুঁড়ে দিয়েছিল আলনার দিকে এখনো সেগুলো ঠিক সে ভাবেই ঝুলছে। ভাঁজ ভাঙা জামা কাপড় পাটে পাটে নিপুণ হাতে ভাঁজ করে তুলে রাখছে উমা।

হিরণ্ময় দেখল উমা আলনা গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল। নিজেকে একা নিঃসহায় মনে হল হিরণ্ময়ের! চোখ বুঁজল। তার মাথার ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবটা এখনো কমছে না। সে ভাবলো উমাকে ডাকবে। ততক্ষণে উমার পায়ের শব্দটা বারান্দা থেকে ঘরের দরজায় এসে থেমেছে। হিরণ্ময় চোখ খুলে দেখল উমা খুব সাবধানে কাচের টুকরোগুলো ঝাঁট দিয়ে জড়ো করছে। জলটা এখনো শুকিয়ে যায় নি। উমার ঝাঁটের দাগে সমস্ত ঘরের মেঝেটা চিত্রিত হতে লাগল। টুং টাং করে কাচের টুকরোর শব্দ।

হিরণ্ময় দেখল খাটের কাছে মেঝের ওপর কোন দাগ নেই। উমা নিচু হয়ে আলনার তলা ড্রেসিং টেবিলের কোণা থেকে ধুলো বের করছে। উমা খাটের কাছে গেল না যেন ঐ জায়গাটা অপবিত্র, জঘন্য বিজানুযুক্ত। নিজের মধ্যে খানিকটা অকারণ হতাশা বোধ করল হিরণ্ময় কেন তা বুঝতে পারল না। সে চোখ খুলে নির্বিষ্টমনে উমাকে দেখতে লাগল। উমা নরম বাঁকে নিজেকে ভেঙে নীচু হয়েছে। ওর কাঁধে আঁচল। হাতের পাশ দিয়ে ওর স্তন, বুকের বাঁক পেটের খাঁজ দেখা যায়। উমার শরীরে ঔদ্ধত্য কম। দেখলেই বোঝা যায় ও একজন মা হয়ে যাওয়া যুবতী। বুকের আকার ঢিলে, পেটের কাছে চামড়া দৃঢ় নয়। সমস্ত শরীরটা যেন ক্রমশ করুণায় মমতায় সিক্ত হয়ে ভরে উঠেছে কিন্তু হিরণ্ময় এ সব কিছু নিরর্থক ভাবে দেখল। হিরণ্ময় ভাবল উমার শরীরে

যেন তার প্রয়োজন নেই। উমার শরীরে কোনো আকর্ষণ নেই।

উমা ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা মুছল। পাউডার স্নো-এর কৌটো ঠুকঠুক শব্দ করে গুছোলো। হিরণ্ময় ভাবল তারা অনেকক্ষণ চুপ করে আছে। ঘরের বাতাস ভারী পাথরের মতো। জানালাগুলো খুলে দিলে হ'ত। কিন্তু উমা জানালা খুলল না। নিঃশব্দে ঘরের আসবাবপত্র মুছতে লাগল, গুছিয়ে তুলতে লাগল, ঘরটা খানিকটা অন্ধকার। কিন্তু বাইরে রোদ্দুর কট্‌কট্‌ করছে। ঘরে বসেও তার আঁচ পেল হিরণ্ময়।

—'আমি আজ অফিসে যাবো না।' হিরণ্ময় বলল। নিজের কাছেই তার গলাটা অদ্ভুত শোনাল। মোটা ভারী শব্দটা গম্‌গম্‌ করল ঘরের বাতাসে। উমার কথার শব্দ শোনার জন্যে অপেক্ষা করল হিরণ্ময়। উমা কথা বলল না। হিরণ্ময় লজ্জা পেল। তারপর রাগে তার শরীর জ্বলতে লাগল। একটা প্রবল অস্থিরতায় সে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে উমার দিকে তাকিয়ে থাকে। উমা কি ভাবছে তা জানবার জন্য,—সে ভাবল,—সে পাগল হয়ে যাবে।

উমা ঝাঁটাটা অবহেলায় ফেলে দিয়ে আঁচল তুলে মুখ মুছতে লাগল। উমা কাজটা এত স্বাভাবিক ভাবে করল যেন বাড়ীতে আজ কিছু ঘটেনি। যেন আজ দিনটা অন্য পাঁচটা দিনের মতোই স্বাভাবিক। হিরণ্ময়ের মনে হ'ল সে সব কিছু ভুল দেখছে। হিরণ্ময় উমাকে বেরিয়ে যেতে দেখল।

গালে হাত দিতে খড়খড়ে দাড়ি তার হাতের তেলোয় লাগে। আজ দাড়ি কামানো হয়নি। উমা রোজকার মতো বারান্দার আলোতে ছোট্ট জলচৌকী পেতে দেয়নি, সব সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখেনি। নিজেকে এ রকম অনিয়মিত মনে হতে খারাপ লাগে। সম্ভবত ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। দম দিতে ভুলেছে হিরণ্ময়।

॥ পাঁচ ॥

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ছে। বেলা এখন অনেক। দিনটা ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। একমুখী স্রোতের মতো এই দিনটা হিরণ্ময়কে যেন কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। সে এই স্রোতে ওলট-পালট, কেন্দ্রচ্যুত অনিয়মিত। দম-না দেওয়া ঘড়ির মতো সময় এবং পরিবেশ সম্পর্কে অচেতন। এখন কটা বাজে তা সে মনে মনে জানতে চাইল। উঠল না। হিরণ্ময় নিজেকে নড়ালো না, যেন নড়লেই এই বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মতো কম্পিত হবে।

হিরণ্ময় ধোঁয়ার গন্ধ পায়। আস্তে আস্তে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ঘরে বন্ধ বাতাসে জমছে। উমা উনুনে আগুন দিয়েছে নিজের না-ধোওয়া মুখে, জিভ বিস্বাদ লাগে। ধোঁয়ার গন্ধে সকাল-সকাল মনে হয়।

হিরণ্ময় কোনো রকমে উঠে দরজার কাছে এসে বলে,—তুমি কি আজ রাঁধবে?' উমা উনুনের কাছে উবু হয়ে বসা। বলল,—তবে না খেয়ে থাকবে?'

—'তোমার ইচ্ছে হলে খেয়ো। আমার রুচি নেই। নিজের গলার ঝাঁঝ টের পায়। হিরণ্ময় উমার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা তার কাছে অসহ্য লাগে।

এক ঘটি জল ঝপ্ ঝপ্ করে উনুনের ওপর ঢেলে উমা উঠে দাঁড়ায়। চোখ দুটো শুষ্ক, তীক্ষ্ণ। এতটুকু বন্ধুত্ব নেই দৃষ্টিতে

—'তুমি না আইনের কথা বলছিলে।' উমা চাপা গলায় বলে

হিরণ্ময় চুপ।

—'আইনকে তোমার এত ভয় কেন? বে-আইনী কাজ যদি কেউ করে থাকে তবে সে শাস্তি পাবে।'

হিরণ্ময় আইন সম্পর্কে উমাকে কি যেন বোঝাতে চাইল আইন সব সময়েই দোষীকে সাজা দেয় না, মাঝে মাঝে নির্দোষীরাও

সাজা পায়। হিরণ্ময় ভাবল এই কথাটা উমাকে বলবে। কিন্তু সে দেখল সাদামাটা ভাবে এটুকু বলা ছাড়া তার আর কিছুই বলার নেই। আইন সম্পর্কে সে সামান্যই জানে। আর পাঁচজন ভদ্র-লোকের মতো—যারা আইন পড়েনি বা আইন ভাঙেনি—হিরণ্ময়ও দেখল যে সে এ বিষয়ে কোনোকালেই গভীর আসক্ত ছিল না। সে দু'একটা ধারার কথা জানে এবং সাধ্যমত সেগুলোকে ভয় করে। অবশ্য মাঝে মাঝে এখানে সেখানে কারো কারো সংস্পর্শে সে আইনের কথা শুনেছে, কিন্তু তাতে তার জ্ঞান বাড়ে নি। কোন্ ঘটনা কোন্ আইনের পর্যায়ে পড়ে। আর তার শাস্তি কি তার জানা নেই। সে দু'একটা ভালমন্দ চেনে কিন্তু সেগুলো আইনের পর্যায়ে পড়ে না। সে জানে সব ভালকেই আইন স্বীকার করে না, আবার সব মন্দই শাস্তি পায় না।

হিরণ্ময় নিজের কপালে হাত দিয়ে চিন্তিত ভাবে দু'তিনবার 'আইন' শব্দটি আপন মনে উচ্চারণ করে চুপ করে থাকে। সে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করে। আইন, পুলিশ কাছারী—এই কথাগুলো তার মনে আসতে থাকে। সে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে যেতে থাকে। জলে ডুবে যাওয়া মানুষের কুটো ধরবার মতো সে একটা সূত্র ধরতে চেষ্টা করে।

—'আইন যদি শাস্তি দেয় আমরা শাস্তি পাবো। কিন্তু চোরের কিল্ খাবো কেন?' উমা বলে,—'ওই জঘন্য ঘটনাটার জন্য দায়ী—সে শাস্তি পাক। আমাদের…মান…সম্মান…ভবিষ্যৎ…কুচ্ছিৎ… কি কুচ্ছিৎ সব…' প্রবল কান্নার মাঝে মাঝে গলা ভেঙে যায় উমার। চোখের জল গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বুকের ওপর পড়ছে। চোখের জলে, কান্নার শব্দে ওর গলার স্বর যেন জলের ভেতর থেকে শুনতে পায় হিরণ্ময়।

এগিয়ে এসে উমা দরজার পাল্লা ধরে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদে। হিরণ্ময় ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। হিরণ্ময় ভাবল উমা আবার ভেঙে পড়বে। সে তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু উমা

ভেঙে পড়ল না। শুধু হেঁচ্কী তোলার মতো আওয়াজ ওর বুক পিঠকে কাঁপাতে লাগল।

উমা চোখ তুলল। জল টলটল করা দুটো তীব্র চোখ। সাপিনীর মত দুলল উমা, তীব্র স্বরে বললো,—'আইনকে তোমার এতো ভয় কেন? কেন? কেন?'

কথার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে হিরণ্ময়ের রোগা কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল উমা,—'আইনকে তুমি ফাঁকি দিতে চাও?'

উমার চোখ তীব্র, স্বর তীব্র। তার কথায় গূঢ় ইঙ্গিত হিরণ্ময় টের পেল। কি বলতে চায় উমা! হিরণ্ময় সচেতন হয়ে কি যেন বলতে চাইল। তার ঠোঁট নড়ল কিন্তু উমা তাকে বলতে দিল না। উমাকে বলতে দিতে হ'ল।

উমা পাগলের মতো, যান্ত্রিক বেগে হিরণ্ময়কে ঝাঁকি দিয়ে বলল,—'তুমি বলতে চাও তুমি কিছু জানো না?…তবে এ পাপ আমাদের বাড়ীতে কেন? আর কারো বাড়ীতে এ ব্যাপার ঘটল না…কেবল আমরা শাস্তি পাবো কেন?'

কান্নার ঝোঁকে ঝোঁকে ও দুলছে। প্রতিটি কথার টানে ওর গলায় বাতাস আটকানোর শব্দ। সেই শব্দ ভয়ঙ্কর। তীব্র। আঁচল খসে পড়েছে। উমা কিছু দেখছে না। হিরণ্ময় কাঠ হয়ে কঠোর চোখ নিয়ে উমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চেতনা ক্রমশ গূঢ় জটিল আবর্তের মধ্যে হারাচ্ছে। সে উমাকে দেখছে কিন্তু সে-দেখা উমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্পর্শ করছে না। সে উমার কথাও সব শুনতে পেল না, শুধু তার দেহের ভঙ্গীর তীব্রতা—ওর সমস্ত শরীরের তীব্রতাকে অনুভব করল।

—'যে এ কাজ করেছে সে তোমাকে ভাল করে চেনে।… তোমাকে চিনতে আর বাকী নেই।…জানি কেন তুমি পুলিশের কাছে যাচ্ছ না…জানি, কেন তুমি আইনের কথা বলছ।…সব জানি…জানি…জানি…যদি পাপ করে থাক তবে সে তার শোধ নিয়েছে…' উমা ক্রমশ শান্ত স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। ওর কথার

শেষে নিঃশ্বাসের বেগ ঘন, গভীর। কথায় টান দীর্ঘ। ওর সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষে ধুয়ে নিয়ে চোখের জল ধারায় ধারায় নামছিল। উমা চোখের সামনে সমস্ত ঘরটাতে ছায়া ছায়া—দীর্ঘ ছায়া দেখতে পাচ্ছিল। ক্রমশ চেতনা লুপ্ত হচ্ছিল উমার। হিরণ্ময়ের মুখটা লাল সাদা, লাল সাদা হয়ে হয়ে ওর দুটো চোখ প্রকাণ্ড গুহার মতো উমার চোখে স্থির। এখন শুধু সে চোখ দুটোকেই দেখতে পাচ্ছিল উমা। কি গভীর ঘন চোখ! গুহার মতো।

গুহার মতো শূন্য চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হিরণ্ময়। তারপর আস্তে তার চেতনা ফিরতে লাগল। প্রতি শিরায় আগুনের মতো রক্তের উচ্ছ্বাস, গতি হিরণ্ময় টের পেলো। সে অনুভব করল তার শরীরের মধ্যে বন্য পশুর মতো ক্রোধ গজরাচ্ছে। সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল হিরণ্ময়ের কাছে। উমার মুখ, নিটোল ভেজা গাল, নরম ঠোঁট দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই সে উমাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য হাত তুলল···

পেছনে খিড়কির দরজায় মৃদু শব্দ বাজল খুট খুট খুট। সেই সঙ্গে হিরণ্ময়ের চড়টা সশব্দে উমার গালে পড়ল। উমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠে ভেঙে গেল। উমা গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর। হিংস্র পশুর মতো নীচু হয়ে হিরণ্ময় উমার নরম খুব নরম সাদা সারসের মতো গলার দিকে লোভীর মতো তাকালো। হাত জড়ো করল···

এবার শব্দটা আরো জোরে। খট্ খট্ খট্। মেয়েলী গলায় কে ডাকল,—'উমাদি!'

॥ ছয় ॥

হিরণ্ময়ের চড়টা সমস্ত চেতনায় রক্তপ্রবাহের মতো গতি সঞ্চার করল। ছায়া-ছায়া ভাবটা সরে গেল চোখ থেকে। উমা চোখ খুলল। হিরণ্ময় দরজার শব্দ শুনেছিল। সে উঠে দাঁড়ালো। দু'পা হাঁটতে গিয়ে দেখল পা অবশ, দেহ শিথিল। কোনো রকমে চেয়ারের ওপর নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল হিরণ্ময়!

উমা উঠে বসে তাড়াতাড়ি চুল ঠিক করল। কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিল। তারপর উঠে মুখ মুছলো। উমা হিরণ্ময়কে দেখল না। হিরন্ময় চোখ তুলল না।

উমা স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে বারান্দা পার হয়ে উঠোনে নামল। খিড়কীর দরজা খুলে দিল। পাশের বাড়ির বৌ বন্দনা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে বলল,—'বাব্বাঃ, কতক্ষণ ধরে ডাকছি। শুনতেই পান না। খুব ব্যস্ত বুঝি।'

বন্দনা ভিতরে এলো। উমা দরজা বন্ধ করে।

বন্দনা ফিরে বলল,—এত শুকনো দেখছি যে। চান করেন নি?

—'করতে নেই।'

বন্দনা ফিক্ করে হেসে বলে,—শুকনো শুকনো আপনাকে বেশ দেখায় কিন্তু।' উমা হাসে। সহজ ভাবে কথা বলতে চেষ্টা করে। বলে,—'তুমি বসবে?

ভ্রূ কোঁচকায় বন্দনা,—'বেশীক্ষণ না। ভাত খেয়ে দেখলাম পান নেই। পান না খেলে যা বিশ্রী লাগে। আছে পান?'

দ্রুত চিন্তা করে উমা। পানের বাটা খাটের তলায়। অন্ধকারে।

—'আনা হয়নি।' উমা হাসে,—ভুলে গেছে আনতে। যা ভুলো মন।'

বন্দনা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের কাছে আসে। পাশাপাশি উমা। বন্দনা উমার দিকে তাকায়। বলে,—বাঁ গালটা অমন লাল যে! কিছু কামড়েছে বুঝি। ইস্ ফুলেছে কতটা...'

উমা গালে হাত দেয়। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে।

হাসতে হাসতে বন্দনা ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিভ কাটে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—'কর্তা বাড়ীতে বুঝি। অফিস নেই?

কোন রকমে গলা পরিষ্কার করে উমা বলে,—'ওমনি। শরীর খারাপ। ভাল আর ক'দিন থাকে!'

খিল্‌খিল্‌ করে হাসে বন্দনা,—তাই গালটা অত লাল। এসে বুঝি ডিস্টার্ব্‌ করলাম!'

—'দূর!' উমা হাসে। তির তির করে চোখ কাঁপায়।

ভেজা জলঢালা উনুনের দিকে চেয়ে বন্দনা থমকায়। বারান্দা দিয়ে খানিকটা দ্রুত চলতে চলতে বলে,—'এ কি! আজ রান্নাবান্না নেই!'

উমা নিজেকে সংযত করে। গলার স্বর ঠিক রাখে, চোখ স্থির রাখতে চেষ্টা করে।

বন্দনা বলে,—'একটা বেজে গেছে, এখনো রান্না চাপাননি!'

উমার গলাটা এবার গম্ভীর হয়, বলে,—'ওর শরীর খারাপ, খায়নি। একার জন্য হাঙ্গামা আর কে করে!'

—'আর স্বপন?'

—'ও দুধ-মুড়ি খেয়ে গেছে। এলে ভাত চাপাবো।'

বন্দনা খিল খিল করে হাসে। উমার কথা বিশ্বাস করে না। বলে,—'রাগ বুঝি! আট বছর বিয়ের পরও? বুঝেছি, মান-ভঞ্জনের সময়ে গালটা লাল হয়েছে।'

বন্দনা হাসতে হাসতে উঠোনে নামে। পেছনে উমা। উমা মস্তবড় একটা নিশ্বাস ফেলে। স্থির হয়। আস্তে আস্তে বন্দনার পেছনে দরজার কাছে আসে।

দরজা খুলে বাইরে এক পা রেখে বন্দনা ফিরে বলে,—'ও গালটাও লাল হোক। আর ডিস্টার্ব করব না।' ও চলে যায়।

দরজা বন্ধ করে উমা আস্তে উঠোন পার হয়। বারান্দায় আসে।

॥ সাত ॥

হিরণ্ময়ের ঘুম পাচ্ছে। এ ঘরে কেমন একটা চাপা গন্ধ। এ গন্ধটা রোদ-পড়া ভেজা মাটির কিংবা এ ঘরের বাতাস একটা ছোট্ট মৃত শিশুর দেহ থেকে এ গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে কিংবা উমার চোখের জলে ভিজে যাওয়া মেঝের গন্ধ পাচ্ছে হিরণ্ময়! ভারী মাথাটা আস্তে আস্তে কোলের ওপরে রাখা হাতের তেলোয় ঝুলে পড়তে থাকে। হিরণ্ময় ঘুমের কথা ভেবে সোজা হতে চাইল। তার মাথার ভেতর নূপুরের শব্দের মতো ঝিম্ ঝিম্ শব্দ। কেউ যেন নাচছে। হিরণ্ময় দেখল, কেউ না। রক্তের স্রোতে আলগা ভাঁটীতে সমস্ত শরীর শীতল করে দিয়ে সরে যাচ্ছে। খোলা বুকে বাতাসের আঁচড়। হিরণ্ময় চোখ চাইতে পারে না। চারদিক অন্ধকার দেখল। হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজল, চোখের সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে উমার চোখ জ্বলছে। হিরণ্ময়ের বুক পুড়ে যেতে থাকে। কি যেন বলতে চায় হিরণ্ময়। ঘড়ঘড় করে শব্দ হয় গলায়।

কখন উমার চোখ সরে গেল। হিরণ্ময় দেখল অন্ধকার। রাত্রি। এখন অনেক রাত। কত রাত সে জানে না। বোধহয় এটা অসীম রাত্রি। উমা কূলকিনারাহীন অন্ধকারে স্রোত সমুদ্রের মতো বহমান। কোনোদিন সূর্য উঠবে না, চাঁদ না, তারা না। শুধু কুলকুল করা অন্ধকারের স্রোত। ঢেউ। ভেজা মাটির গন্ধ। অচেনা ফুলের গন্ধ, জলের গন্ধ। সব অন্ধকারে ঢাকা। যেন কেউ অনেক দুঃখের কান্না দিয়ে এই অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে। আকাশ ছোঁয়া অন্ধকারের ঢেউ। কিন্তু আকাশ নেই। কোনোকালে ছিল না। শুধু হিরণ্ময়—আর তার সত্ত্বা. চেতনা সজাগ। কোন দিকে এ অন্ধকার বিস্তৃত তা সে বুঝতে পারল না। না পূর্ব, না পশ্চিম—কোনো দিক নেই—

হিরণ্ময় যে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা অথৈ অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে চলে গেছে। সোজা, সরলভাবে টানা। নিয়তির মতো অমোঘ। সে পথের ওপর আলোর দণ্ডের মতো একটু নিশানা। পথের পাশে সরলরেখার মত দণ্ড—সামান্য আলোকিত হিরণ্ময় ভাবে ওটা গ্যাস লাইটের পোষ্ট। হিরণ্ময়… ভয়ে জর্জরিত হিরণ্ময় সেই আলোর দিকে ক্লান্ত একটা পোকার মতো হাঁটিতে থাকে। কেন হাঁটছে তার কোথায় সে জানে না।

আলোর কাছে হিরণ্ময় থামে। ভয়। এ কেমন আলো। আলোর রঙ পাথরের মতো কঠিন ধূসর। বৃত্তের মতো নিটোল। সেই সুবৃত্ত গোলাকার আলোয় পথ কঠিন, নির্মম। আর সেই আলোর নীচে নিজের পুঞ্জীভূত-ছায়ার ওপর প্রকাণ্ড এক প্রহরী। তার পাথরের মতো মুখ। চোখ। সে চোখে পলক নেই। সে দেহে স্পন্দনের অভাব। যেন চিরকাল সে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের দীর্ঘ বর্শা কয়েক শতাব্দী ধরে স্থির। সে এই কূল কিনারাহীন অন্ধকারে দুর্লভ আলোটুকুকে পাহারা দিচ্ছে। তার দেহের ভঙ্গী আদেশের মতো কঠিন, সরল।

হাতের ছোট্ট ঝোলাটার দিকে হিরণ্ময় তাকায়। সে ঝোলার ভেতরে স্পন্দন-হীন, শ্বাসহীন, প্রাণহীন মৃত শিশুর দেহ। অন্ধকারে চাপা। হিরণ্ময়ের ভয়ের মতো, পাপের মতো। সে এই শিশুকে আরো নিশ্চিন্ত অন্ধকারের হাতে রেখে আসবে। পেছনে ফেরবার পথ নেই। যেন অন্ধকার, বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার পুরোনো জংধরা লোহার কালো দরজার মতো পথ আটকেছে। সামনে আলো। এই আলোর বৃত্তটুকু পার হলে হিরণ্ময়কে আর কেউ দেখবে না। তার বাঁ হাতে শাবল সেই অন্ধকারে গর্ত খুঁড়বে, তারপর আস্তে আস্তে হিরণ্ময় ছোট্ট একটু অচেনা শিশুর দেহকে ঢাকবে।

হিরণ্ময় এই আলোর বৃত্তটুকু পার হবে। কিন্তু কেমন করে? হিরণ্ময় এই আত্মজিজ্ঞাসার জবাব পেল না। আলোর বৃত্তের মধ্যে

যাওয়া নিষিদ্ধ। কোনো পাপ, কোনো অশুচি তাকে স্পর্শ করবে না। পাহারাওলার কণ্ঠস্বর বজ্রের মতো বাজবে—গম্ভীর পর্বত-শ্রেণীতে প্রতিহত প্রতিধ্বনির মতো গভীরতর হবে অসহায় দুর্বল হিরণ্ময়কে কম্পিত করবে।

প্রাণপনে কাঁদল হিরণ্ময়। সে কাঁদতে থাকল। পাহারাওলা ফিরে দেখল না। আলোর বৃত্ত। স্থির অন্ধকার বহমান। ঢেওয়ের শব্দ গভীর গুহাতে প্রতিহত। অচেনা ফুলের গন্ধ, অচেনা শিশুর মৃতদেহের গন্ধ, মাটির গন্ধ। নিজের কান্নার শব্দ সে শুনলো না। অসীম অনন্তকালের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময় অসীম অনন্তকালের আলোর দিকে চেয়ে থাকল। সে স্থির পাথরের দেহের মতো হয়ে যেতে লাগল—

প্রথমে হিরণ্ময়ের দেহটা পড়ল সশব্দে। তারপর চেয়ারটা। শানের ওপর অস্বাভাবিক শব্দ হ'ল। সেই শব্দে বারান্দায় খুঁটির সঙ্গে ঠেস-দিয়ে-বসে-থাকা উমা চমকাল। থরথর করে কাঁপল উমা। সে শব্দ কান্নার ঢেউ তুলল গলায়। উমা দাঁড়াল। খুঁটি ধরে ঝোঁক সামলাল।

উমা ঘরে আসে। প্রকাণ্ড এক মাকড়সার মতো মেঝের ওপর। মেঝের সঙ্গে লেপ্টে আছে হিরণ্ময়। মৃতদেহের মতো স্থির। উমা ভাবল হিরণ্ময় আর চোখ খুলবে না। আর কোনদিন হিরণ্ময় স্পন্দিত হবে না। হিরণ্ময় মৃত।

হিরণ্ময় চোখ খুলে উমাকে দেখল। উমার দুটো চোখ রক্ত-গোলাপের পাপড়ির মতো। ভেজা ভেজা। হাত পাখাটা দ্রুত-গতিতে তার মুখের ওপর বারবার উমার মুখটা ঢেকে দিচ্ছে। সাঁই সাঁই বাতাসের শব্দে। নিজের চোখেমুখে জলের ছিটে অনুভব করে হিরণ্ময়। বিন্দু বিন্দু জল চোখ গাল বেয়ে গলায় বুকে পড়ছে। জলের স্বাদে নিজের পিপাসাকে তীব্র ভাবে অনুভব করে হিরণ্ময়। রক্তস্রোত শীতল। প্রবাহিত। না-খাওয়া, না-স্নান করা শরীর দুর্বল।

—'উমা !' হিরণ্ময় ডাকল।

—'উঠো না।' উমা বলে।

—'উমা !'

উমা উঠে দরজার কাছে সরে গেল। স্থির হয়ে হিরণ্ময়কে দেখতে লাগল। সেই চোখে অবহেলা। ঘৃণা। যে ভাবে উমা পাশের বাড়ীর বেড়ালটাকে দেখে সে ভাবে দেখল হিরণ্ময় উঠে বসেছে। হাতের ওপর ভর। হাতটা কাঁপছে।

স্খলিত গলায় হিরণ্ময় ডাকে,—'উমা ! প্লীজ, উমা, প্লীজ, বিশ্বাস কর।'

—'কি ?' উমা বলে।

হিরণ্ময় নিজের ঠাণ্ডা কম্পিত শরীরকে হামাগুড়ি দিয়ে উমার কাছে আনল। হাঁটু গেড়ে বসল উমার পায়ের কাছে। উমা নড়ল না। হিরণ্ময় দু' হাতে উমার দু' হাত নিজের গালে চেপে ধরল। উমার হাতের ওপর হিরণ্ময়ের চোখের জল টুপ্-টাপ্ পড়তে লাগল। বিস্মিত উমা হিরণ্ময়কে প্রথম কাঁদতে দেখল।

—'আমি রেণুর কাছে যেতাম'—অদ্ভুত এক আবেগ হিরণ্ময়ের গলা চেপে ধরল।

উমা দেখল সামান্য রোদ্দুর হিরণ্ময়ের রুক্ষ চুলের ওপর পড়েছে। ওর জলে ভেজা মুখ আলোকিত, দুটো চোখ ভাষা-বহুল। ওর গালের হাড় ভেজা মুখের ওপর স্পষ্ট। খুব রোগা দেখাল হিরণ্ময়কে।

—'কে রেণু !' উমা নিশ্বাস বন্ধ করে বলে।

—'রেণুর সমস্ত শরীরে ঘা হয়েছিল। সে ঘায়ে ভুগে ভুগে রেণু দশ বছর আগে মারা গেছে—'

নিজের স্পন্দনহীন শরীরে একটা আবর্ত অনুভব করে উমা। বমি বমি ভাব। নিজেকে স্থির রেখে উমা বলে,—'তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।'

—'কিন্তু সে দশবছর আগে মারা গেছে!' ব্যাকুল ভাবে হিরণ্ময় তাকায়।

—'তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।' উমার গলা স্থির।

—'কিন্তু সে দশবছর হ'ল মারা গেছে।' হিরণ্ময় কাঁপে। রেণুকে তার পর্বতের মত প্রকাণ্ড আর কঠিন মনে হয়।

—'তার মানে রেণু নামে এক বেশ্যা—। তুমি তার কাছে যেতে!'

—'তুমি সবটা শোনো। তুমি জানো না—'

'—তুমি কথা বোলো না। আমি শুনতে চাই না—বোলো না—' সে অদ্ভুত ক্রুর দৃষ্টিতে হিরণ্ময়কে দেখে—'যে একবার যায় সে বারবার যায়—'

উমা হিরণ্ময়কে ঠেলে দেয়। হিরণ্ময় রবারের পুতুলের মতো বসে থাকে। বলে—'আমাকে তুমি কি করতে বল!'

উমা বারান্দার দিকে সরে যায়। হিরণ্ময় তীব্র পিপাসাকে অনুভব করে। সে উমার দিকে তাকিয়ে থাকে। উমার প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে দূরে, পঙ্কিল কোনো আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। যেন উমার ওপর তার জীবন মরণ নির্ভরশীল—এমনি ভাবে হিরণ্ময় তাকিয়ে থাকে। নিজেকে রিক্ত, শূন্য মনে হয় তার।

—'তুমি পুলিশের কাছে যাবে'—উমার উন্নত বুক দ্রুত শ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করে। উমা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে,—'তোমার পাপের জন্য আমরা শাস্তি পাবো না'—

—'আমাকে কি করতে বল!' হিরণ্ময় উঠে দাঁড়ায়।

—'পুলিশকে আসতে দাও। যা হয় তারা করবে!' উমা বলে,—'যেই করুক এ কাজ, তারা তাকে ধরবে। সবাইকে জানতে দাও।'

হিরণ্ময় হতাশ হয়ে কপালে হাত রাখে। বলে,—'তোমার কি মনে হয় এ কাজ—'

—'জানি না।'—উমা পিছন ফিরে উঠোনের দিকে চলে যায়।

অন্ধকারে ফিরে এসে হিরণ্ময় অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে জামাটা গায়ে দেয় হিরণ্ময়। দরজা খোলে। উমা নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়াল। কেউ কোনো কথা বলল না।

হিরণ্ময় পথে নামল। উমার দিকে ফিরে তাকাতে সাহস হল না।

চলতে চলতে হিরণ্ময় পেছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেল।

॥ আট ॥

প্রায় বিকেল। দরজায় ধাক্কা শুনে উমা বারান্দা থেকে ঘরে এল। দরজা খুলল! প্রথমে হিরণ্ময়ের রুক্ষ চুল আর মাথা তার চোখে পড়ল। তার পেছনে তিনটে টুপি, চামড়ার বেল্ট, খাকী জামা। রাস্তার ওপর অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তাদের কাটা কাটা কথা —চাপা শব্দ—বিস্ময়ের ধ্বনি উমার কানে গেল।

হিরণ্ময়ের পিছনে দুটো টুপি-ওলা লোক ঘরে ঢুকলো। ভারী জুতোর লোহার নালের শব্দ। একজন দরজার বাইরে রইল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল হিরণ্ময়। চাপা সুরে কি যেন বলল!

স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে স্বপন বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল। দরজার শব্দে চোখ ঘুরিয়ে সে তার বাবা আর দু'জন পুলিশকে ঢুকতে দেখল! টপ্ করে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের কোণে গিয়ে দাঁড়াল স্বপন।

ছায়া-ছায়া অস্পষ্টভাবে উমার চোখের সামনে ক্ষীণ বিকেলের আলো ক্ষীণতর হয়। ভারী জুতোর আওয়াজ মেঝের ওপর হাতুড়ীর মতো। বাতাস কম্পিত। চকচকে চামড়ার বেল্ট—চৌকো মুখের দুজন কঠিন মানুষ—হিরণ্ময়ের রুক্ষ চুল শুকনো মুখ উমার সামনে কাটা কাটা ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের আসবাবপত্রগুলো এত অর্থহীন যে উমা ভেবে পেল না সে কোথায় আছে। এটা অন্য কারো বাড়ী—তার মনে হয়। অন্ধকার ঘরটাতে দু'একটা আলোর রেখা কোথা থেকে এসেছে। ঘরটা মোটা তুলির টানে আঁকা কোনো অর্থহীন ছবির মতো। উমা এই ছবির কোন মানে বুঝল না।

চৌকো কঠিন মুখের একজন নীচু হয়ে অন্ধকারে খাটের তলায় হাত বাড়ালো। এক্ষুনি একটা কিছু ঘটবে। কি ঘটবে তা উমা

জানে না। হয়ত' কিছুই ঘটবে না। আসলে হয়ত' কিছুই ঘটেনি। খাটের তলাটা ফাঁকা।

কে যেন সুইচ টিপল। আলো তীব্র তীক্ষ্ম ঢেউ তুলে ঝল্‌সে উঠল। উমা ভাবল বুকচাপা কবরের অন্ধকারে সে এতক্ষণ বসে ছিল। কেউ আলো জ্বালল। উমা নিঃশ্বাস টানে। এখন বাতাস।

শিরশির করে মেঝের উপর শব্দ হয়। উমা চেয়ে দেখল ন্যাকড়ায় জড়ানো পুঁটলির মতো বাচ্চাটা নিশ্চিন্ত নীরব হয়ে ঘুমোচ্ছে। মেঝের ওপর। কঠিন মেঝের ওপর ওর নরম ছোট্ট অবিশ্বাস্য আকৃতি সহজভাবে শুয়ে। চৌকো মুখওলা লোকটা প্রকাণ্ড ছায়া দানবের মতো ওকে ঢেকে আছে। সহজভাবে দেখছে ওকে।

যেন কিছুই ঘটেনি এমনি সহজভাবে লোকটা উঠে দাঁড়াল। কি যেন বলল। কাটা কাটা কঠিন অস্পষ্ট শব্দ। ধাতব শব্দ। উমা কোনো অর্থ খুঁজে পেল না। হিরণ্ময় চাপা গলায় কথা বলছে। সবাই কথা বলছে। উমা ড্রেসিং টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ঘরের দিকে মুখ রেখে আলোয় ঘরটা দেখছে।

দুটো তীব্র চোখ উমার ওপর পড়ল। খাকী পোষাক পরা একজন উমাকে দেখছে। উমা শুনল লোকটা কথা বলছে। তাকে। উমা শুনতে চাইল, বুঝতে চাইল। কিন্তু তার কাছে কিছুই বোধগম্য হ'ল না। সম্ভবত হিরণ্ময় সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিতে চায়। কিছু একটা ঘটবে—কোনো অপ্রাকৃত ঘটনা। যে ঘটনার সঙ্গে তাদের সংসারের পরিচিত জীবনের, ভাবনার কোনো মিল নেই। হয়ত' অদ্ভুত কিছু তাকে বলবে লোকটা।

হিরণ্ময় অধৈর্যভাবে উমাকে দেখল।

হিরণ্ময় উমার কাছে আসে। তার কাঁধে হাত রাখে। উমা কোনো স্পর্শকে অনুভব করে না।

হিরণ্ময় উমার কানের কাছে নীচু হয়ে বলে,—'তুমি যা জানো, বল।'

—'আমি জানি না'—উমার স্বর প্রায় অস্পষ্ট শোনায়।

লোকটার চোখ আরো তীব্র।

উমা ভয় পায়। লোকটা তাকে অদ্ভুত ভাবে দেখছে। উমা কথা বলতে চেষ্টা করে। এই প্রথম সে নিজের গলার স্বর শুনল। যে স্বর অর্থহীন—এড়িয়ে যাওয়া। ভাষা স্পষ্ট নয়। সে বুঝতে পারল একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে চলেছে—যে ঘটনা তাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে।

উমা তার গালে গরম জলের স্পর্শ পায়। সে বুঝল সে কাঁদছে। সে শুনল সে বলতে চাইছে—সে কিছু জানে না। তাদের কোনো দোষ নেই।

লোকটা হাসে। মৃদু বাতাস বয়। উমা স্থিরতর হয়।

আবার ভারী জুতোর শব্দ বাতাসে তরঙ্গ তোলে। ওদের পেছনে হিরণ্ময় দরজার কাছ থেকে বারান্দায় সরে যায়। উমা ঘরে দাঁড়িয়ে অনুভব করে তিন জোড়া পা সমস্ত উঠোন ভাঁড়ার ঘর ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজছে।

—'তুমি ক'টায় স্কুলে যাও?'—কে যেন জিজ্ঞেস করল। ভারী মোটা গলা।

—'সাড়ে নটায়।'—স্বপনের বিস্মিত গলা। পাখীর মতো সরু।

—'আচ্ছা, আচ্ছা। বে—শ। তুমি খেলা করতে যাও।'—ভারী মোটা গলা। স্বপনের ছায়া দরজার কাছে কাঁপে। স্বপন ভেতরে ঢোকে না কিংবা বাইরে যাবে বলে সদর দরজার কাছেও আসে না। স্বপন চৌকাঠেয় ওপর স্থির।

উমা স্থির হয়ে থাকে। অনুভব করে সময় স্রোতের মতো স্পন্দনশীল হয়ে বইছে। শ্বাসরোধ করা যন্ত্রণায় উমা ক্রমশ দুর্বলতর। সে ভাবে সে আর কোনদিন স্বাভাবিক হবে না।

কতক্ষণ সময় কাটে তা উমা জানে না। বোধহয় একটা যুগ।

আবার পায়ের শব্দ। নিকটতর। গলার আওয়াজ। তিন

জোড়া পা।

—'মেথর আসবার জন্য বাথরুমের পেছনে দেয়ালে একটা ফোকর আছে।'

—ভারী মোটা গলা।

'ওঃ।'—অন্য জন বলে।

হিরণ্ময় কি যেন বলে অস্পষ্ট ভাবে। শোনা যায় না।

তারপর ওরা দরজার কাছে আসে। জুতোর শব্দ। প্রথমে হিরণ্ময়।

—'এটা একটা চালাকী'—হিরণ্ময়ের পেছন থেকে কে বলল। উমা সেই শব্দে কাঁপে।

—'মানুষের রীতিনীতি যতদিন না বদলাবে,ততদিন—' মোটা ভারী গলা। কথা শেষ হওয়ার আগেই ওরা তিনজন পাশাপাশি ঘরের মেঝের ওপর দাঁড়ায়। একজোড়া কালো প্রকাণ্ড জুতো বাচ্চাটার পায়ের কাছে। আর একটু এগোলে বাচ্চাটার পায়ের আঙুল থেঁতলে যাবে।

মুখে হাত তুলে চীৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সামলায় উমা। চোখ বেয়ে জল পড়ে। চৌকো কঠিন মুখ দুটো চিন্তিত। ভ্রূ কোঁচকানো। হিরণ্ময় অসহায়ের মতো।

তারপর ওরা তিনজন রীতিনীতি আইন পাপ পুণ্য নিয়ে কথা বলতে থাকে। উমা উল্টো পাল্টা শোনে। কিছু বুঝতে পারে। কিছু পারে না।

—'ঘাবড়াবার কিছু নেই। এ রকম হামেশাই হচ্ছে—' একটা ভারী মোটা গলা। একটা চৌকো মুখ! ক্রূর চোয়াল হিরণ্ময়ের দিকে ফেরানো,—'তবে এ ঘটনা নতুন। এর কোনো অর্থ নেই। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

লোকটা হিরণ্ময়ের ঘাড়ে সান্ত্বনার ভঙ্গীতে হাত রাখে। হিরণ্ময় হাসতে চেষ্টা করে। তারপর লোকটা কার যেন নাম ধরে ডাকল। উঁচু পর্দায় সে স্বর ধমকের মতো শোনায়। সেই শব্দই

যেন সদর দরজাকে নাড়া দিল। ঝনাৎ করে দরজা খুলে আর একজন ভেতরে আসে।

উমা দেখল লোকটার টুপির ছায়া মুখের ওপর পড়েছে। লোকটার মুখ অস্পষ্ট ঋজু। সাদা দেয়ালের ওপর ওর মুখের আকৃতির একটা আভাষ উমা দেখল।

আঙুল দিয়ে বাচ্চাটাকে দেখিয়ে অন্যজন কিছু বলল। দরজা খুলে যে ঢুকেছিল সে নীচু হয়ে বাচ্চাটার দিকে হাত বাড়াল।

উমা তীব্র ভাবে কাঁপে। মোটা ভারী কালো হাত। বাঁকানো এবড়ো খেবড়ো আঙুল। কুচ্ছিৎ। সমস্ত হাতটা আর তার প্রকাণ্ড ছায়া কালো হয়ে বাচ্চাটাকে ঢাকল।

কখন জুতোর শব্দ থামল। ওরা কখন চলে গেল উমা টের পেল না। সে ড্রেসিং টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল।

অর্থহীনভাবে চোখ তুলে দেখল অনেক মানুষের ছায়ায় ঘরটা ভর্তি। কারা যেন ঘরে ঢুকছে। কাতারে কাতারে। ছোট ঘরটা তাদের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার। হিরণ্ময় তাদের কাছে কিছু বলছে। অস্পষ্ট শব্দ। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো। উমা কিছু শুনল না, স্পষ্ট ভাবে দেখল না। অনুভব করল তার শরীরটা হাল্কা। কিছু ঘটেনি। কোনো কিছুই না।

তারপর তার দেহটা সশব্দে পড়ল। মেঝের ওপর। পায়ের শব্দ। কারা বাইরে যাচ্ছে। হিরণ্ময়ের দ্রুত কণ্ঠ। কানের খুব কাছে স্বপনের নিঃশ্বাস। দরজার শব্দ। এলোমেলো।

তারপর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

॥ নয় ॥

রাত্রি।

কত রাত হিরণ্ময় জানে না।

'আমি ভয় পেয়েছিলাম।' উমা বলে, উমার গলা স্বাভাবিক।

হিরণ্ময় উমার ছায়া দেখল। দেয়ালে বন্ধুর ছায়া। উমা হাত তুলে খোঁপার কাঁটা খুলে ড্রেসিং টেবিলের উপর ছুঁড়ে দেয়। টুংটুং করে কাঁটাগুলো ছড়িয়ে পড়ে। উমা আয়নায় নিজেকে দেখে।

মশারীর ভেতর থেকে হিরণ্ময় মশারীর বাইরে উমাকে দেখে। উমা আয়নায় নিজেকে দেখে। উমার লালচে মুখ দেখতে হিরণ্ময়ের লজ্জা করে। হিরণ্ময় কথা বলে না। ঘুমন্ত স্বপনের কাছ থেকে সরে এসে নিজেই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়।

জলের সোঁদা সোঁদা গন্ধ। সমস্ত ঘরটা ধোয়া মোছা। দেয়ালে জলের দাগ। হিরণ্ময় মৃদু ফিনাইলের গন্ধ পায়।

উমা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে দেখে। উমা মগ্ন হয়ে আছে।

—'কিছু বলছ না যে!' উমার গলার স্বর গাঢ়।

—'কি বলব?' হিরণ্ময় বালিশে মুখ রাখে।

টিপ্ বোতাম খোলার মৃদু শব্দ। উমা ব্লাউজ খোলে। ফর্সা সাদা বাহু উন্মুক্ত হয়। হিরণ্ময় উমার গভীর বুকের অংশ সাদা গজদন্তের মতো রঙ দেখে। উমার শরীরে স্বেদ মৃদু মিষ্টি গন্ধ সমস্ত ঘরটাকে আস্তে আস্তে ভরে তোলে।

সমস্ত ঘরটা ক্রমশ উমার শরীর হয়ে উঠতে থাকে। আকর্ষক উত্তেজক এই ঘর। উমার শরীর আলোতে প্রকাশমান।

হিরণ্ময় আলো দেখে। পাউডারের মৃদু কণা নরম ঘামের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। উমা পাউডারের কৌটো ঘুরিয়ে দেখে। ঠক্ করে শব্দ হয়।

হিরণ্ময় কেমন লজ্জা করে। যেমন উমাকে ছোঁয়া বারণ। উমা অন্য কারো বৌ। বালিশে মাথা রাখে হিরণ্ময়। সারাদিনের ক্লান্তি এখন নেই। হাল্কা শরীর। হিরণ্ময় সারাদিনের কথা ভাবতে চাইল। ভাবতে পারলো না।

উমার শরীরে গন্ধ তার চেতনাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করেছে।

উমা মুখ টিপে হাসে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বেঁকে দাঁড়িয়ে কপালের ওপর কুঁচো কুঁচো চুল সাজায়। বলে,—গোঁসাইয়ের বুঝি রেণুর কথা ভাবা হচ্ছে?'

হিরণ্ময় চমকায়। তারপর চুপ করে থাকে। ভাবে, সে রেণুর কথা ভুলে যাচ্ছে। ভুলে গিয়েছিল। তারপর আলোয় রেণুর মুখ ভাসে। হিরণ্ময় চোখ চায় না। রেণুর মুখ চোখ বুজে দেখে। ক্রমশ একটা পাপবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে। যেন রেণুর জন্য চোখের জাল পেতে অপেক্ষা করে হিরণ্ময়। সেই জালে রেণু ছোট্ট ভীরু মাছের মতো কাঁপে। রঙীন মাছটা বন্ধ জলে খেলছে। ...রেণু জালের ভেতরে নিজের শরীর কাঁপায়। উমা রঙীন মাছের মতো নড়ে...রেণু কাঁপে। হিরণ্ময়ের বুকে মাথা। চুলের গন্ধ।

হিরণ্ময় পাশ ফিরে শোয়।

হিরণ্ময় উমার গলা শুনতে পায়। উমা বলে,—'আমার ইচ্ছে ছিল বাচ্চাটাকে একটু সাজিয়ে দিই। সারাদিন ছিল এ বাড়ীতে —উমার গলার স্বর লালায় ভেজা! করুণ হিরণ্ময়ের কানে অনেকক্ষণ ধরে স্বরটা বাজতে লাগল।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ল বাচ্চাটার ডান হাতে একটা আঙুল ইঁদুরে কামড়ে নিয়েছিল। রক্ত ছিল না। সাদা কচি মাংস কাটা জায়গাটা থেকে ঝুলছিল। ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে যেতে লাগল হিরণ্ময়। এ ঘরে নতুন বাতাস খেলা করে। যেন কিছু ঘটেনি। এ বাড়ীতে। কিছুই না। যেন দুঃস্বপ্ন এতক্ষণ সারাদিন তাকে মগ্ন রেখেছিল! সে বোকার মতো উমার কাছে নিজের পাপের

কথা বলতে গিয়েছিল। উমা এখন রেণুর কথা জানে। কিন্তু উমা এখন স্বাভাবিক। হিরণ্ময় নিজের জন্য দুঃখ পেল।

সুইচ টেপার শব্দ। অন্ধকার ঢেউয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো উমা বিছানায় পড়ল। শব্দ। হিরণ্ময় চমকে ওঠে। উমার গায়ের গন্ধ। বাইরে মৃদু জ্যোৎস্না। কাচের শিশিতে সাদা আলো।

উমা বিশ্বস্তভাবে তার বুকে মুখ রাখল। হিরণ্ময় ভাবল এই অন্ধকারে সে উমা বা রেণুর তফাৎ চিনবে না। কে উমা, আর কেই বা রেণু—তাকে কে বলে দেবে? সে দুঃখিতভাবে চাঁদের আলো দেখল। চোখ বুঁজে অনুভব করল অন্ধকার অসীম অনন্ত সমুদ্রের মতো ঢেউ। না উমা, না রেণু, কাউকে চেনা যায় না। অন্ধকার ফুলের মতো সুগন্ধময়। স্বেদ, মানুষের ভেজা চামড়া, চুলের মৃদু গন্ধ। উমার নগ্ন শরীর হিরণ্ময়ের নগ্নতার কাছে উন্মুক্ত!

অন্ধকার শুদ্ধ সঙ্গীতের মতো স্পন্দনশীল।

ক্রমশ তারা আরো সতর্ক হবে। আরো সতর্ক, আরো ভাবলেশহীন।

চুম্বনের শব্দ।

ছোট বৃত্তে তারা ধরা পড়ল।

হিরণ্ময় একটা ঝাঁকি দিয়ে উমাকে সরিয়ে দিল। উমা কথা বলল না।

তারা ক্লান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে স্বাভাবিক মানুষের মত ঘুমোতে লাগল।

যদিও অনেকক্ষণ হল ভোর হয়েছে এবং সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল তবু বাদল চোখ বুজে শুয়ে ছিল। নোনা ধরা দেয়ালে রোদ পড়ে ভেজা শ্যাওলা থেকে যে বাষ্প উঠছে তার সঙ্গে ধুলো আর-শোলা আর ইঁদুরের গন্ধ মিশে আছে। এই গন্ধকে চোখ বুজে সকালের কুয়াশা আর জলজ উদ্ভিদের গন্ধ, পানাপুকুরের আঁশটে গন্ধ মনে হয়। মনে হলেই ভাবে এখন সদ্য ভোর হতে চলল—ভাল করে আলো ফোটেনি, বাইরের মাঠের ঘাসের ওপর এখনো টলটল করছে শিশির। 'কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আছি' ভাবল বাদল, 'নড়ছিওনা।' নড়লে কিংবা পাশ ফিরলে চৌকিটাতে মড়মড় করে শব্দ হয়, আর সেই শব্দে পরিবেশের ভিতরে কাচের মতো শৌখীন কি একটি জিনিষ ভেঙে যায়।

বাদল নড়ল না। শরীরের ভঙ্গী বদলাতে তার ভাল লাগে না। একভাবে থাকতেও যে তার ভাল লাগে তা নয়, কারণ কিছুক্ষণ একভাবে থাকলে কোনো হাড়ের সন্ধিতে যে সামান্য চিন্‌চিনে ব্যথাটা দেখা দেয় সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে, আর তখনই তার মনে হয় যে গত বছর শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে তার যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল তা কখনো সারেনি'। বাস্তবিক সারা বছরই যেন সে ভুগছে এবং এখন সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা মধ্যযুগের নিপুণ সওয়ারের মতো তার ওপর চেপে বসেছে। তার শরীরে জ্বর নেই, গাঁটে গাঁটে সেই অসহ্য ব্যথাও নেই যাতে নিজের শরীরের হাড় মট্‌মট্‌ করে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। বাস্তবিক তার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল মাত্র একবার—গত বছর শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে। কিন্তু

সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলো তার শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা সেরে যাওয়ার পরও প্রকট। সারা বছর ধরে সে যেন একটিমাত্র ইন-ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে। তার মনে হ'ল তার চোখ সত্যিই জ্বর আসবার কয়েকঘণ্টা আগেকার মতো জ্বালা করে, হাতের তেলো গরম আর লাল, কোমরে পায়জামার কষির নীচে একটু একটু ঘাম জমে আছে। কাশতে গিয়ে তার মনে হ'ল তার কাশির শব্দটাও অদ্ভুত। কোনো ধাতুর শব্দের মতো। কেমন ঝিমঝিমিনি ভাব। মনে হয় যেন সারা রাত ঘুম হয়নি।

'হয়ত সত্যিই আমি রাতে ঘুমোয়নি' সে ভাবল, 'শুধু ঘুমই বলে নিজেকে ফাঁকি দিই।' হয়ত সারারাত সে চোখ বুজে কিছু ভেবেছে—সেই ভাবনা এমন গভীরভাবে তাকে আচ্ছন্ন ক'রেছিল যে সেগুলোই চলচ্চিত্রের মতো স্বপ্ন হয়ে চোখের সামনে ঘুরে গেছে। এই সংশয় ছুরির মতন তার বুকে বেঁধে। কে তাকে বলে দেবে রাতে সে ঘুমোয় কিনা ?

এই মুহূর্তে বাদল রাতে না ঘুমোন অসুস্থ বাদলের জন্য ভীষণ দুঃখ অনুভব করতে লাগল। সে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না সত্যিই সে রাতে ঘুমিয়েছে কিনা। কেননা তার মনে সারারাত ধরে সে ইঁদুর আরশোলা আর জমে থাকা ধুলোর গন্ধ পেয়েছে।

সে ভাবে 'আসলে আমার কিছুই হয়নি। এ আমার দুঃখ-রোগ' সে ভাবল, 'এ আমার নিয়তি।' অনেক বেলাতে ঘুম ভাঙলে পাশ-বালিশ জড়িয়ে ধরার ভঙ্গীতে শুয়ে 'এখনও ভোর হয়নি, মাঠে এখনও শিশির'—ভাবতে পারা কি সুন্দর! 'এইখানে কাছাকাছি কোথাও একটা ফাঁকা মাঠ এমনি পড়ে আছে শুধু শিশির পড়বে। বলে, যে মাঠটা আমি কখনো দেখিনি, দেখবো না, খুঁজবো না। জানি মাঠটা আছে—বোধহয় আছে।' দুঃখ-রোগগ্রস্ত বাদল ভাবল। 'আমি বোধহয় সত্যিই রাতে ঘুমোইনা—শুধু ঘুমোই বলে নিজেকে ফাঁকি দিই, আসলে সারা বছর ধরে গতবছরের ইন-

ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছি।' বাদল ভাবল। সে ভেবে পেল না যে বাদল অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে ভোরের শিশিরের গন্ধ পায় এবং ভাবে এই কাছাকাছি কোথাও একটা মাঠ পড়ে আছে এবং যে বাদল গতবছরের ইনফ্লুয়েঞ্জাতে সারাবছর ভুগছে তারা এক কিনা।

নিজেকে নিয়ে এ তার ভীষণ সংশয়। বাদল ছট্‌ফট্ করতে থাকে। বেলা গড়িয়ে গেল আস্তে আস্তে। ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে গেল। সারাদিন সে পাশের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনল। কেউ এল, কেউ গেল, কেউ ঘুরে ফিরে কি যেন দেখল। সারাদিন সকলেই কাজ নিয়ে আছে। শুনল—কারো দাঁতে বুরুশ ঘষবার শব্দ, কেউ গানের একটা কলি গাইল, তারপর কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ফিরে শুধু সুরটা ধরে রইল। জল ঢালবার শব্দ।

বাদল কাজে গেল না। প্রায়ই সে যায় না। তার মনে হল প্রবল জ্বরের ঘোরে সে রয়েছে। একটা আলো-আঁধারির মধ্যে দিনটা কেটে যেতে লাগল। যেন তার চারদিকে অর্থহীন ভাঙাচোরা ত্রিকোণ, অর্দ্ধবৃত্ত, সরলদণ্ডের মতো আলো আর ছায়া হয়ে জ্বরটাই তাকে ঘিরে আছে। তার চোখের পাশে আলো আর ছায় দিয়ে কারা যেন খিলানের পর খিলান ভাঙা স্তম্ভের সারি তৈরি করে রেখেছে।

'এ আমার দুঃখরোগ, সে ভাবল 'এ আমার নিয়তি।' সে নিজেকে নিয়ে ভাবতে লাগল।

নিজেকে নিয়ে ভাবতে গেলেই বাদল তার জনৈক বন্ধু সুধা বিন্দু হয়ে যায়। স্পষ্ট করে দেখতে পাবে বলে বাদল অন্য কেউ হয়ে নিজেকে ভাবে। যেন সে বাদলের কেউ না,—সম্পূর্ণ নি সম্পর্কীয় জনৈক বন্ধু মাত্র যার নাম দেওয়া যায় সুধাবিন্দু।

বাদল সুধাবিন্দু হয়ে ভাবেঃ বাদল একটি সাদা রঙের —এত সাদা যে দেখলে ঘিন্ ঘিন্ করে। তার মুখে ক কব্জীতে কৃমির মতো আঁকাবাঁকা নীল শিরা দেখা যায়। নানা উ সর্গ তার আছে। সে অনেক কিছুকে ভয় পায়,—যেমন নিজেকে

তার অনেক সংশয়—যেমন সে কবিতা লেখে, কিন্তু গোপনে তার কবিতা আমি কমই পড়েছি। সম্ভবত তাতে জল, জলজ উদ্ভিদ এবং গ্রামীন মেয়েদের কথা থাকে। আমার মনে হয় বাদল কবি-টবি কিছু নয়। ও অসুস্থ মানুষ। কোনো কোনো বিষয়ে তার গভীর অভাববোধ আছে মাত্র। বাদল কারুরই প্রিয়পাত্র নয়। ওর ঘিনঘিনে সাদা রঙ এবং নীল শিরা ছাড়াও ওর চোখে মুখে একটা উগ্র ক্ষুধা এবং তার অবদমনের চেষ্টা এক সঙ্গে ফুটে থাকে। হয়ত' সে কারণেই যে স্কুলেও একশ' টাকা মাইনের একটা চাকরী করে সেখানেও ওকে কেউ পছন্দ করে না এবং বেনেটোলা লেন-এর যে মেস-এ থাকে সেখানে সে অস্থির হয়ে দিন কাটায়। বাস্তবিক সে প্রায় সঙ্গীহীন। স্কুলে তার সঙ্গী ছাত্ররাই। ক্লাশে বাদল পাঠ্যবই কদাচ স্পর্শ করে না, শুধু অনর্গল আজে বাজে কথাবার্তা বলে ছাত্রদের ঠাণ্ডা রাখে। এই নিয়ে স্কুল কমিটির মিটিঙে দু'বার তাকে তাড়িয়েদেবার কথা হয়েছে, কিন্তু বাদল শেষ পর্যন্ত টিকে আছে। হয়ত স্কুল কমিটি ভাবে যে ছাত্রদের এমনিতেও কিছু হবে না, মাষ্টার বদল করতে গিয়ে অনর্থক বিজ্ঞাপনের টাকা গচ্ছা যাবে। স্কুলে তাই তার সঙ্গী ছাত্ররাই—তার মধ্যে বুড়ো বাচ্ছা সব ধরনের ছেলেই আছে। আমার মনে হয় তার সঙ্গী সেই সব ছাত্ররাই যারা বাথরুম বা পায়খানার দেওয়ালে অশ্লীল কথা লিখে রাখে। বাদল ভাবে হয়ত সে একটা কিছু করবে। হয়ত' সে এম-এ পরীক্ষা দেবে। কিন্তু কোনো একটা ভাবনা নিয়ে থাকা তার স্বভাব মাত্র। হয়ত সে কোনো দিনই পরীক্ষা দেবে না।

সংশয় কাঁটা হয়ে তার বুকে ফোটে যেন সে দীর্ঘ দিন বেঁচে আছে। যেন বহু বহু পুরনো হয়ে যাওয়া সব কিছু তাকে ঘিরে আছে। 'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।' সারা দিন সে শুয়ে শুয়ে বিচিত্র শব্দ শুনল। কাজে গেল না—প্রায়ই সে যায় না।

বিকেলে কোথাও যাবে বলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

॥ দুই ॥

দশ টাকার নোটটা এগিয়ে দিতে গিয়েই বাদল বুঝল ভুল হয়ে গেছে। এখন আর ফেরবার উপায় নেই।

কণ্ডাকটার হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা নোটটা নিল। বাদলের দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখ সরাল না। বাদল ওর মুখটার দিকে তাকাল না। ওর হাতের শিরা দেখছিল। যেন লোকটা সারা দিন তেতেপুড়ে ভীষণ রেগে আছে, ওর মুখের দিকে তাকালেই বাদল সেই রাগ দেখতে পাবে। এই সামান্য কারণেই তার চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল।

কণ্ডাকটর তার হাতটা নিজের দিকে সরিয়ে নিল না। বাঁ হাত দিয়ে দ্রুত ঘণ্টি বাজিয়ে একটা স্টপেজ ছেড়ে দিল। আঙুল দিয়ে টিকিটে 'টিরিক' শব্দ তুলল। নোটটা বাদলের দিকেই বাড়িয়ে রেখে বলল, 'খুচরো দিন। বাস-এ এ-নোটের ভাঙানি পাওয়া যায় না।

'নেই। খুচরো করতে ভুলে গিয়েছিলাম।' বাদল ভাবল সবাই তার কথা শুনতে পাচ্ছে। সে সারি সারি জামা আর হাতের অংশ দেখতে পাচ্ছিল। খুব ভারি। বাস পরের স্টপেজে থামছে, কিংবা সামনেই হয়ত ট্রাম। গতি শ্লথ। কণ্ডাকটর তার দিকে নোটটা বাড়িয়ে রেখে পিছন ফিরে পার্টনারকে কি যেন বলল। বাদল শুনতে পেল না। খুব গরম লাগছে। ঘাম শুকিয়ে যাওয়া জামার নোনা গন্ধ। চারদিকে ময়লা মুখ, ধুলো লাগা কালো কালো। সব মুখ একরকম, যেন দশবার দেখলেও মনে থাকবে না। বাদল কোনো মুখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নীচু করে ছিল।

'খুচরো দিন।' কণ্ডাকটর মাথা ঝাঁকিয়ে রাগ দেখাল।

'নেই। খুচরো করতে ভুলে গিয়েছিলাম।' বাদল বলল।

'কোথায় যাবেন?'

'যাদবপুর।'

'তবে আর কি করবেন এমনিই চলুন। বাঁ হাতে মাথার ওপর নোংরা তেলচিটে প্রায় কালো দড়িটা দ্রুত বাজাল কণ্ডাকটর। 'টিরিক করে শব্দ তুলল। 'এটা নিন'—নোটটা বাড়িয়ে দিল তেতেপুড়ে রেগে যাওয়া রুক্ষ চুলওয়ালা কর্কশ কণ্ডাকটর।

অবিলম্বে বাদল সাদা হয়ে গেল। নোটটা নিল মুঠো করে। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল 'আমি নেমে যাচ্ছি।'

'আপনার ইচ্ছে।' কণ্ডাকটর ভীড় ঠেলে সামনের দিকে এগোতে এগোতে বলল। বিড় বিড় করছিল—'বহুবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে এ সব নোটের ভাঙানি ট্রামে বাসে পাওয়া যায় না।

'আপনার নোটটা দিন, ভাঙিয়ে দিচ্ছি।' কেউ বলল। ভীড়ের ভিতর প্রথমে বাড়িয়ে হাতটাই দেখতে পেল বাদল। হাত বেয়ে বেয়ে মুখটা পেল। এক বুড়ো ভদ্রলোক তার একটা হাত গলাবন্ধ কোটের ভিতরের পকেটে ঢোকাচ্ছেন। বাসটা ঝাঁকানি দিল। ভদ্রলোকের সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। কয়েকটা হাত তাকে ধরল। তার ভঙ্গী দেখে বাদলের মনে হ'ল যে এতে তার কিছু মোটা লাভ হবে। সে হাসল। ইচ্ছে হ'ল হাতের নোটটা ভদ্রলোকের মুখে ছুঁড়ে মারে। তারপর দুর-দার ঘুঁষি চালিয়ে এই ভীড়ের ভিতর রাস্তা করে নেমে যায়।

'না, আমি নেমে যাচ্ছি।' বাদল বলল।

'কেন?'

'এমনিই, কাজ আছে।'

'কি হ'ল?'

'কিছু না, তবু নেমে যাচ্ছি দেখছেন না?' সে গলায় রাগ আনল।

সারিবাঁধা মানুষদের নিতম্ব, যেন মাংসের স্তূপ ঠেলে সে গেটটার কাছে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল যারা

দাঁড়িয়ে আছে তাদের লাথি মেরে শুইয়ে দিয়ে যায়। জামা শার্টে পুরোনো ঘামের গন্ধ। মুখ ফিরিয়ে কেউ বলল 'কাত হয়ে যান' 'আস্তে যান।' রাস্তা কেউ দিচ্ছে না। কেউ কেউ সামান্য শরীর বাঁকাচ্ছে।

'রাস্তা দিন।'

'রাস্তা করে নিন। দেখছেন তো—' কেউ বলল।

ঠুং করে ঘণ্টি বাজল। প্রায় ধাক্‌কা খেয়ে বাদল নামল তাকে কেউ ফিরেও দেখল না। বাস-টা নির্বিকারভাবে চলে গেল।

এখন সে নিজেকে নেড়ী কুকুরের মতো অপমানিত বোধ করতে লাগল। 'আমার একটা কিছু করা উচিত ছিল' সে ভাবল 'অন্য কেউ হলে করত।' কি করত তা বাদল বুঝতে পারল না কিন্তু উত্তেজিত হ'ল—এত উত্তেজিত যে স্থিরভাবে কোনো কিছুর দিকে তাকাতে পারছে না, বুঝতে পারছে না কোথায় এসেছে। মনে হ'ল কেউ তাকে চুচ্‌মাড় করে দিচ্ছে। যেমন তার কোনো কিছুই তার বশে নেই। হাত পা সব অন্য লোকের। দুঃখটা শুধু তার। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে বাদল।

সে এক পাও নড়ল না। যেন সে অন্য কেউ। সে ভাবতে চাইল না কিছু। ভাবল। আমি বাদল। তুমি বাদল? বেশ! এ রকম কোটী কোটী লোক আছে যারা জানে না যে তুমি বাদল— বাদল বলতে তোমাকে বোঝায়, তারা তোমাকে কখনো দেখেনি। কখনো দেখবে না। তুমি আছো কি নেই তারা জানে না। বাস-এ ভীড়ের ভিতর এরকম লোক ছিল। কি ভীষণ ইনসিগনিফিক্যান্ট তুমি।

নিজেকে নিয়ে সে ভীষণ সঙ্কটে পড়ল এইবার। অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে। বার্ণিশের গন্ধ—কতকগুলো নীচু আলোকিত কাঠের আসবাব-পত্রের দোকান। কাদের ছায়া চকচকে আলমারীর কাঠের পালিশ করা তক্তার ওপর ঘুরছে। সে নিবিষ্ট হয়ে ঝক্‌ঝকে আসবাবপত্রের দোকান দেখে। এখন সন্ধ্যে। আলো।

লোকজন। বড়ো রাস্তা। একটা লোক বিকারহীন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশ দেখছে। কোথায় আছে ঠিক করতে পারল না। কোথায় তার দুঃখ তাকে বলছিল তোমাকে অপমান করা কত সহজ। খুব সামান্য কারণেই তোমাকে অপমান করা যায় কারণ তুমি ভীড়ের একজন মাত্র—প্রায় অস্তিত্বহীন।' কোনো বিষয়ের ওপর মনকে স্থির রাখা প্রায় অসম্ভব মনে হ'ল।

তবে বেঁচে থেকে কি লাভ যদি সামান্য কারণেই নিজেকেই নেড়ীকুত্তার মতো মনে হয়? এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে এবার ভিন্নতর চিন্তা করতে লাগল। আমি বাদল—যাদবপুরে পিসীমার বাড়ীতে যাচ্ছিলাম। সেখানে আমার জন্যে পায়েস রাঁধা ছিল। এই শীত শীত ভাব—ঠাণ্ডা জমা পায়েস—নতুন গুড়ের গন্ধ। কিন্তু, আমি বাদল—বাদলের জন্যে পায়েস রেঁধে রাখবার লোক ক'জন আছে? আমি বাদল যাবো এই আশা করে কোটী কোটী জনের মধ্যে ক'জন থাকে? বাদল হ'য়ে আমি কতটুকু আছি? আমি কতটুকু নেই?

সেইক্ষণে বাদল বাদলের জন্য ভীষণ দুঃখ অনুভব করতে লাগল। বাদল অনুভব করল অপমানিত বাদলের জন্যে সে প্রায় কাঁদতে পারে।

এরকম মাঝে মাঝে হয়। 'এ আমার দুঃখ রোগ' সে ভাবে 'এ আমার নিয়তি।'

আজ রাস্তায় খুব ভীড়। এখন সন্ধ্যে। কিন্তু এ সময়েও রোজ এত ভীড় দেখা যায় না। বোধ হয় আজ কোনো উৎসবের দিন। কিন্তু কোন উৎসব তা বাদল ভেবে পেল না। কোনো ছুটির দিন ছিলনা আজ। তবু দিনটা বোধ হয় উৎসবেরই ছিল—যে উৎসবের খোঁজ বাদল এখন আর রাখে না। প্রায় সকলেই দল বেঁধে হাঁটছিল। যে কোনো অচেনা দেশের উৎসবের ভিতরে হঠাৎ এসে পড়েছে সে—এখানকার রীতি নীতি আইন কানুন কিছুই তার জানা নেই- এমনি ভীষণ একা নির্জন পরিত্যক্ত লাগ-

ছিল নিজেকে। যেন এখনো চোখের পাশে ত্রি-কোণ, দীর্ঘ রেখা, অর্ধবৃত্ত, সরল দণ্ডের মতো আলো আর ছায়া তাকে ঘিরে আছে।

অর্থহীন সবকিছু মনে হয়। দুঃখময় সবকিছু মনে হয়। বাদল সুধাবিন্দু হয়ে বাদলকে ভাবছিলঃ বাদল যেন দুর্লভ ধাতুর তৈরী কোনো প্রাচীন ঘণ্টার মতো—খুব মৃদু কম্পনও যার মধ্যে অবিকল শব্দের তরঙ্গ তোলে। কোনো কবিতায় যেমন সে কাঁদে, কোনো গানের আসরে বসে যেমন সে কেঁদেছিল। আর সবকিছুই যেন ওলট পালট এলোমেলো হয়ে আছে। যেন চূড়ান্ত একটা টেনশনের মধ্যে সে দিন কাটায়। হয় ভেঙে যাবে, নয়তো ফেটে পড়বে। হয়ত বাদল কারো কারো প্রিয় হতে চেয়েছিল। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই সে কথা বলতে চেয়েছে। সে কথা বলে আস্তে, কথায় কোনো ইঙ্গিত থাকে না এবং হাস্যময় থাকবার চেষ্টাও তার আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ তার অত্যন্ত ঘিনঘিনে সাদা রঙ, নীল শিরা, বাচন ভঙ্গী—এই সব মিলিয়ে সে তার চতুর্দিকে একটা বিরাগের পাঁচিল তুলে রাখে। সাধারণ মানুষের কাছে কোথায় যেন সে প্রিয় হতে পারে না। একবার বাস-এ টিকিট কাটবার সময়ে ভুল করে দশ টাকার নোট দেওয়াতে কণ্ডাকটর তাকে এমনিতেই যেতে বলেছিল। কিন্তু বাদল যায়নি, নেমে গিয়েছিল। অন্যলোক হ'লে হয়ত, বাদলের মতো নেমে যেতো না। কারণ এই সব ক্ষেত্রে কণ্ডাকটর উপায় নেই যখন তখন ভদ্রতার খাতিরেই যাত্রীদের খানিকটা যেতে দেয়, কিন্তু বাস-এ বসে যারা এই ঘটনা লক্ষ্য করেছিল তাদের মত নিলে জানা যেতো যে কণ্ডাক-টরের মুখে অকারণে যে আক্রোশ ফুটে উঠেছিল তা আশ্চর্য। এবং প্রায় নির্দোষ বাদল নেমে যাওয়ার পর বোধহয় তার মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসির আভাষ দেখা গিয়েছিল। বাদলের রঙ অত সাদা না হ'লে এবং নীল শিরা দেখা না গেলে—ধরা যাক বাদল একজন সুপুরুষ সুসজ্জিত ভদ্রলোক হলে হয়ত' এরকম হত না। মনে হয় এক ধরনের হীনমন্যতায় সে অবিরত ভোগে, তাই সে দ্রুত

নেমে গিয়েছিল। এও তার দুঃখরোগ—খুব সামান্য আঘাতে তার মন অবিরল দুঃখের তরঙ্গ তোলে। সারাটা সময় সে চূড়ান্ত টেনশনের ভিতরে আছে। আলোর অস্তিত্ব যেমন কোনো বস্তুর ওপর প্রতিভাত হলেই মাত্র বোঝা যায়, তেমনি বাদলও হয়ত' নিজের অস্তিত্বকে বোঝবার জন্যে পরিবেশের ওপর প্রতিভাত হতে চায়। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে এ তার ভীষণ সংকট। কেউ তাকে বলে দিক যে সে আছে।

ভিতরে একটা শীতল ভাবকে অনুভব করছিল বাদল। কিছু-দিন আগেকার সেই গুমোট গরমের ভাবটা আর নেই। মনে হয় শীত আসছে। এখন একটু শীত। জমাট কুয়াশা। জরগ্রস্ত সবকিছু মনে হয়। সে ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলো টের পাচ্ছে। একটু উত্তেজনার দরকার। সে ভাবল একটা সিগারেট খাবে। পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। উজ্জ্বল দোকান।

'একটা সিগারেট।' সে হাত বাড়িয়ে পয়সা দিল। 'ওই তো বাদল' সে প্রায় চমকে উঠে নিজেকে দোকানের আয়নায় প্রতিফলিত দেখল। যেন সে ভিন্নজনকে দেখছে এমনি আগ্রহ নিয়ে নিজেকে দেখতে লাগল। বাদলকে বাদলের ভাল লাগছিল। সে অন্যমনস্ক-ভাবে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে লাগাল। কোথায় যেন নিজের ওপর তার গভীর বিশ্বাস আসছিল।

'আমি বাদল' সে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, 'আমি সব সময়ে সবকিছুর ওপর যদি নিজেকে প্রতিফলিত করতে পেতাম!'

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল যদিও রাস্তাটা তার অচেনা তবু যেন খুব নিশ্চিন্ত অমোঘভাবে সে বেনেটোলা লেন-এর ধুলো, আরশোলা আর ইঁদুরে ভর্তি ঘরটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। যেন এ তার নিয়তি—অচেনা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে চেনা রাস্তায় হঠাৎ এসে পড়া। 'আমি এক্ষুনি ফিরবো না' সে ভাবল। যেখানে দাঁড়াল সেটা তার সম্পূর্ণ অচেনা অদ্ভুত এক বাস স্টপ্! 'এখন মাত্র সন্ধ্যে, আমি এক্ষুনি ফিরবো না—' এই

ভেবে সে সেই বাস স্টপে দাঁড়িয়ে একটা মেয়েকে লক্ষ্য করে।

মেয়েটির দেহ উদ্যত, সামনের দিকে একটু ঝুল-খাওয়া—গোড়ালি তুলে শুধু পায়ের পাতার ওপর ভর করে আছে। 'এক্ষুনি চলে যাবো—যে কোন মুহূর্তে আছি কি নেই—যাচ্ছি—এমনিভাবে সমস্ত দেহে চলে যাওয়ার আভাষ নিয়ে সবুজ শাড়ির আঁচল চেপে মেয়েটি দাঁড়িয়ে। এক্ষুনি আঁচল ছেড়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরবে। এতটুকু চিহ্ন রেখে যাবে না। ছিল কি ছিল না—বাদল ভাববে। পানের দোকানী তার উজ্জ্বল দোকানের ম্রিয়মান দৃশ্য দেখে।' বাদল ভাবল—কি ভীষণ ভঙ্গুর চিত্র সব—একটুতেই মুছে যায়—ভাল করে তৈরী হওয়ার আগেই ভাঙে। বাদল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল দোকানের পর দোকান—এপাশে ওপাশে। অজস্র অসংখ্য অবয়ব জ্যামিতিক আকার নিয়ে ঘুরছে। নাক মুখ চোখ কিছু বোঝা যায় না। ওয়াশ-এর ছবির মতন। শুধু অপেক্ষামান মেয়েটি স্থির—যেন বহুকাল ধরে দেহে চলে যাওয়ার আভাষ নিয়ে স্থির আছে। অথচ যাবে। মেয়েটির জন্য বাদল দুঃখিত হ'ল। যেন এই দৃশ্যটি মুছে যাওয়া তার পক্ষে মারাত্মক। যেন চলে যাওয়ার মানে মরে যাওয়া-ওই অবয়ব বাদল আর কখনো দেখবে না। যেন সে দাঁড়িয়ে কারো মরে যাওয়া দেখছে, কিছু করতে পারছে না। দেহের ভঙ্গী বদলে গেলেই একটা সূক্ষ্ম মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটে—বাতাসে তার কোন চিহ্ন থাকে না। শুধু মনে ক্ষীণ ক্ষীণতম স্মৃতি কিংবা আভাষের মতো হয়ে থেকে যায়। অতীতে কারো আত্মমগ্ন কোন গভীর ভঙ্গী তার মনে আছে। ভঙ্গুর দৃশ্য সব—পলকেই পালটায়।

'আমি হাজার হাজার ঘণ্টা এইখানে আছি' বাদল ভাবে, 'কেমন ক্লীবের মতন ঠাণ্ডা হয়ে আছি। কেউ জানে না আমি আছি কি নেই। কে জানে আমি কতখানি আছি। যতক্ষণ আঘাতে বিরত ততক্ষণ জানব না।

মেয়েটি আলোর থামের নীচে ব্রোঞ্জের মূর্তি হয়ে আছে। বাদল

ধান পোকার গানের মতো ধীর গতিতে মেয়েটির কাছে আসে।

বাদল আপন মনে কয়েকটি সংলাপ তৈরী করে। 'আমি বাদল। কোন সময়ে আছি জানি না। সংশয় নিয়ে আছি সারাক্ষণ, কে আমাকে বলে দেবে আমি আছি কিনা।'

বাদল চমকে উঠে নিজের গলার স্বর শুনল। এই প্রথম। যেন সে আপন মনে ভাবতে ভাবতে বলছিল 'আমি আছি কিনা।'

মেয়েটি পলকে মুখ তুলল। বাদল দেখল রাস্তার আলো ওর মুখে পড়ে চাঁদের আলোর মতো হয়ে গেল।

'কি বলছেন?' মেয়েটি বলে। সন্দেহ। বাদল ভাবল বোধহয় চোর-জুয়াচোর এবং ধর্ষকদের সম্বন্ধে ওর অভিভাবক ওকে সতর্ক করে রেখেছে। ইচ্ছে হ'ল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'দেখ তো আমি আছি কিনা।'

বাদল একটু হেসে বলল, 'বলছিলাম এই রাস্তায় বাস ভীষণ দেরী করে আসে।'

মেয়েটি কথা বলে না। কুঁচকে যায়। কোন অস্থিহীন উদ্ভিদ-পোকার মতো। যেন এক্ষুনি ও ওর হাত-পা-মাথা শরীরের ভেতরে টেনে নেবে। বাদল মুহূর্তে সুধাবিন্দু হয়ে নিজেকে দেখছিল—ঘিনঘিনে সাদা রঙ, নীল শিরা, উগ্র ক্ষুধা এবং অবদমনের ভাব একসঙ্গে ফুটে থাকা মুখ। বাদল ভাবল বাদলের জন্য ভীষণ দুঃখে সে আর্তনাদ করে উঠতে পারে।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তা দেখছে। সবুজ আঁচলে চিবুক ঢাকা। বাদলের ভীষণ ইচ্ছে করছিল। যেন কিছু বলা দরকার—ভয়ঙ্কর দরকার। মেয়েটি ক্ষণভঙ্গুর দৃশ্য হয়ে আছে—এক্ষুণি কোথাও চলে যাবে—কোথায় যাবে বাদল জানে না। জানবে না। বাদলের ইচ্ছে হচ্ছিল এমন কিছু করে যাতে মেয়েটি চিরকাল তাকে মনে রাখে। হয়ত সেই ঘটনার কথা মেয়েটি বিয়ে হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পর পুরোনো হয়ে যাওয়া স্বামীর কাছে বলবে। হয়ত হাসির ছলেই বলবে, কিন্তু বলবে, আর

তারপর অনেকদিন ধরে তার কথা মনে রাখবে মেয়েটি।

মেয়েটি সতর্ক চোখ দিয়ে বাদলকে দেখল। একটু সরে গেল। অধৈর্য ! বাদলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। 'খুব সেয়ানা মেয়ে' বাদল ভাবে, 'খুব চতুর। তবু আমি সব কথা তোমাকেই বলতে পারি, কেন না তোমাকে বিশ্বাস করবার প্রশ্নই ওঠে না, কে জানে প্রতিটি চুম্বনের জন্য তুমি পয়সা গুণে নাও কিনা। হয়ত সেই কারণেই তোমাকে সব কথা বলা যায়।'

'কিন্তু কি বলব ?' ভাবল বাদল, 'কি বলবার আছে আমার ?' অনুভব করে বলবার ভীষণ আবেগমাত্র আছে, কিন্তু আসলে সে কিছুই বলবার মতো খুঁজে পেল না। একটি টল্-টল্ করা দৃশ্য শুধু চোখের ওপর পদ্মপত্রে জলের মতো কাঁপছে।

মুহূর্তেই সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে বাস এল। চলে গেল। মেয়েটি বাস্-এর জানালা থেকে এক পলক বাদলকে দেখল। যেন বলল, তুমি কিছু চেয়েছিলে। সব কিছু দিতে পারতাম।

মেয়েটি নিশ্চিহ্ন। পোড়া ডিজেলের গন্ধ, একটু ওড়া ধুলোর গন্ধ। বাদলের মনে হয় তার চারদিকের পরিবেশ, চলন্ত অবয়ব, সাজানো দোকান সবকিছু একটা বিকৃত মুখের মতো যার একটা চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। পরিবেশের মুখে সেই চোখটা একটা ক্ষীণস্থায়ী দৃশ্যমাত্র হয়ে ছিল।

পলকে বাদল বাদলকে নিয়ে একটা ঘটনা তৈরী করতে লাগল। যেন সে বাদলকে কেউ না,—বাদল অন্য কেউ—একটি ঘটনার নায়কমাত্র। বাদল আর সেই নিশ্চিহ্ন চতুর মেয়েটিকে নিয়ে ঘটনাটা এইরকম :

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। রাস্তাটা খুব নির্জন। এতক্ষণ যারা কাছাকাছি ছিল তারা যেন বাতাসের সঙ্গে শুকনো অর্থহীন পাতার মতো কোথাও মিলিয়ে গেছে। তারা একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত শহরের নির্জন পথে হাঁটছিল।

'কি নাম তোমার ?'

'প্রীতিলতা। তোমার ?'

'বাদল। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ?'

'যাদবপুর।'

'কোথায় থাকো ?'

'রিফিউজী কলোনী। বিজয়গড়—যাদবপুর।'

'সেখানে তোমার কে আছে ?'

'মা বাবা সবাই।' মেয়েটি—আশ্চর্য—উত্তর দিল।

'আমার পিসীমা যাদবপুরে থাকেন।'

'কোথায় ?'

'বিজয়গড়।' বাদল উত্তর দিল—'আমরাও রিফিউজি।'

'আমরাও।' মেয়েটি উত্তর দিল 'আমি ছেলেবেলা থেকেই ওখানে আছি ?' 'তুমি কোথায় থাকো ?'

'এইখানে—বেনেটোলা লেন্-এ। আমি একা।'

'কেন, তোমার বাবা ?'

'বাবা নেই' বাদল কষ্টে বলল—'মা পাকিস্তানে আমাদের বিষয়-সম্পত্তি আগলে রাখে। মাকে আমি বহুকাল দেখি না।'

'মাকে আনিয়ে নাওনা কেন ?'

'মা, এখন অন্যদেশের নাগরিক, আমি অন্যদেশের। আইনতঃ আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।'

'ধুৎ' মেয়েটি হাসল।

'সত্যি। আমার মা এখনো বিশ্বাস করে একদিন প্যাকিস্তান উঠে গিয়ে সব আবার আগেকার মত হবে। মা জানে তখন আমি মার কাছেই থাকব। মা শুধু সেদিনের অপেক্ষা করছে।'

মেয়েটি বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাদলের চোখদুটো দেখা যায় না। চশমার কাচে আবছা আলো খেলছে। ওর মুখটা করুণ রোগা মনে হয়।

'একা একা মাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না!'

'হয়। মাঝে মাঝে আমি ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে মার

কথা ভাবি। চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই সন্ধ্যেবেলায় ঝুপ ঝুপ অন্ধকার হয়ে আসে কুয়োতলার পাশে কালকাসুন্দের ঝোপ লেবুতলা, ওপাশে কুলবড়ই গাছটায় বাদুড় ঝোলা অন্ধকার। মাটি আর জলের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়—যেন এইমাত্র বৃষ্টি হয়ে গেল। আর কাঁচ লেবুপাতার নীচে, কালকাসুন্দের ঝোপে, ঘাসে, পেয়ারা পাতায় চারদিকে চক্‌মক্‌ করে জোনাকী পোকা। সেই অন্ধকারে দাওয়ায় ছোট্ট একটু আলো নিয়ে মস্তবড় একটা অন্ধকারে মা বসে আছে। মা যেন সেই ছোট্ট একটু আলো জেলে বহু বহু বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে আমি যাব বলে। মার চোখ মনে পড়লেই আমার একটা মস্তবড় ছায়ায় ঢাকা দীঘির কথা মনে পড়ে, যার জল ছিল খুব কালো, যার থৈ ছিল খুব গভীর।'

মেয়েটি হাসল 'আমার মা বাবার ভীষণ ঝগড়া হয়। মাঝে মাঝে মাকে মারে। আমার তখন খুব কষ্ট হয়। ঝগড়া হলেই আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে আসি। আজ যেমন এসেছি।'

দুঃখিত বাদল মেয়েটির পিঠে হাত রাখল, বলল 'থাক। বোলো না। অন্য কথা বল।'

'বেশ।' মেয়েটি আবার হাসল

ওরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছিল। কেউ কোথাও নেই। এটা ইডেন গার্ডেন। ওরা জলের কাছে বসল। দুজনে পাশাপাশি। বাদল প্রীতিলতাকে চুম্বন করে।

'তুমি কি কর ?' মেয়েটি হঠাৎ বলল।

'একটা স্কুল মাষ্টারী করি।'

মেয়েটি চমকে মুখ ফেরাল। বাদলের চশমার ঝাপসা কাঁচ দেখল। শীর্ণ সাদা মুখের আভাষ। তারপর ঘাস থেকে ডাঁটা তুলে মুখে দিল। অন্যমনস্ক হয়ে রইল। খুব হতাশ হল প্রীতিলতা।

'অন্য কিছু কর না কেন ?'

'কেন ?'

'মাষ্টার মানেই তো ইস্কুল বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ, পড়াশুনো—এইসব।'
'তাতে কি?'
'কেমন ভয় ভয় করে।'
'তুমি স্কুলে যাওনা?'
'যেতাম। এখন ছেড়ে দিয়েছি।'
'কেন?'
'এমনিই। হ'ল না। ইস্কুল ভাল লাগে না।
'মাষ্টারকেও না?'
'মাষ্টার মনে হলেই কেমন যেন 'স্যার স্যার' মনে হয়।'
'পাগল!'
কিছুক্ষণ চুপ।
'আমার জ্যাঠামশাই মাষ্টার ছিলেন। খুব সরল, আর খুব বোকা মনে হ'ত।'
'বোকা বোকা, ভীষণ বোকা। বিশ্রী।' মেয়েটি হাসল। বাদল শিউরে উঠল।

হেসে ঘাসের ওপর গড়িয়ে গেল মেয়েটি। সমস্ত শরীর ছড়িয়ে দিল।

কাছাকাছি কেউ নেই। শুধু কয়েকটা মাছ পায়ের কাছে খেলছে। অন্ধকারে দেখা যায় না। শুধু শব্দ শোনা যায়। কেউ নেই। কেউ নেই। শুধু তারা দুজনে একা। প্রীতিলতা অন্ধকারে ব্রোঞ্জের মূর্তি হয়ে আছে। নীচু হয়ে বাদল প্রীতিলতাকে চুম্বন করল। প্রীতিলতা হাসল।

'এই নিয়ে সাতাশবার।' প্রীতিলতা বলল।
'কি গুণছ?'
'আমি যা নিই সব গুণে নিই।'

বাদল ভীষণ চমকে উঠল। সোজা হয়ে বসে বলে 'অন্ধকারে তুমি টাকাও কি গুণে নাও?'

'গুণবার মতো টাকা আর পাবো কোথায়?' খুব আস্তে যেন

অনেকদূর থেকে প্রীতিলতার গলা অন্ধকারে ভেসে এল 'ছেলে-বেলায় যখন বাবা পয়সা দিত তখন বার বার গুণতাম।' প্রীতিলতা হাসল।

'কেন, তুমি টাকা পাও না?'

'না।'

'কেউ তোমাকে দেয় না? মনে কর আমার মতো কেউ?'

'কেন দেবে?'

বাদল ঘেমে উঠল। বলল 'এমনিই। বন্ধু বলে।'

মেয়েটি হাসল 'কেন নেব?'

'নিলে কি হয়? কিছু দিলে কিছু নেওয়াও উচিত।'

পরের কাছ থেকে টাকা পয়সা আমি কখনো নিই না। ছেলে-বেলা থেকেই বাবা মা নিতে দেয় না।'

'ও।' বাদল চুপ করে থাকে। যেন কেউ তাকে জোরে চড় মেরেছে।

'তুমি কি ভাবছ?' প্রীতিলতা বলল।

'কি যেন, জানি না।'

'মনে হয় তুমি খুব কষ্ট পাও। মনে মনে। তোমার মুখ—'

'জানি।'

প্রীতিলতা তার হাত বাদলের মুখের ওপর রাখল। কপালে হাত বুলিয়ে দিল।

'এত ভাবো কেন? এইসব কষ্টের কথা ভুলে যাও। দুঃখ কার নেই, পাঁচজন পাঁচ রকম দুঃখ নিয়েই তো আছে। তুমি তোমার দুঃখের কথা শোনাতে গেলে তারাও তাদের পাঁচটা দুঃখের কথা শোনাতে পারে।'

'আমি তো কাউকে বলি না।'

'আমি টের পাই। তুমি আপন মনে কষ্ট পাচ্ছ। তোমার একটা কিছু করা উচিত।'

'কি?'

'কোনো কাজ—খুব পরিশ্রমের কাজ।'

বাদল চুপ করে প্রীতিলতার অন্ধকার মুখের দিকে চোখ রেখে প্রীতিলতার কথাই ভাবছিল। বলল, 'ভাবছি একটা পরীক্ষা দেব।'

'কি পরীক্ষা?'

'এম-এ।'

প্রীতিলতা হাসল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল 'আবার সেই পড়াশুনো, বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ আর মাষ্টার মশাই! কি হবে এত পড়াশুনো করে?'

'জানি না।' বাদল ম্লান হয়ে বলল 'একটা কিছু তো করা উচিত।'

'পড়তে পড়তে তোমার ক্লান্তি লাগে না?'

অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে রইল।

'এত ভেবো না। 'এ কষ্ট তৈরী করে কি লাভ! প্রীতিলতা হঠাৎ বলল 'তার চেয়ে বরং মাকে নিয়ে এস।'

'কেন?'

'এমনই' প্রীতিলতা মুখে সবুজ রঙের আঁচল চাপা দিয়ে হাসল, 'মা এসেই তোমার বিয়ে দেবে।'

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। বলল 'চলি।'

'এক্ষুণি?'

'এরপর বাড়ীতে বকবে।'

'আবার কখন আসবে, এইখানে?'

'আসব না।'

'কেন?'

'এমনিই' হাসল মেয়েটি 'আর কি দরকার!'

'আমি যে ভীষণভাবে তোমাকে চাই।'

'আমি চাই না' বলল মেয়েটি 'আজ মন খুব খারাপ ছিল তাই তোমার সঙ্গে ঘুরলাম। অন্যদিন মন খারাপ হ'লে আর কারো সাথে ঘুরব। আমি কাউকে অনেকদিনের জন্য চাই না।'

'কেন ?'

'ভীষণ পুরনো মনে হয়। বলে বলে পুরনো হয়ে যাওয়া কথা, দেখে দেখে পুরনো হয়ে যাওয়া মানুষ।' বলতে বলতে প্রীতিলতা শ্বাস দীর্ঘ করে।

যেমন অন্ধকারে প্রীতিলতা কাঁদল। বাদলের মনে হ'ল কাঁদতে কাঁদতে মোমবাতির মতো গলে গলে যাচ্ছে প্রীতিলতা। ক্ষয় হয়ে হয়ে হয়ত মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

বাদলের মনে হ'ল তার হাত ছেড়ে দিয়ে কেউ চলে গেল। পাখী মাটি থেকে কিছু খুঁটে খাওয়ার সময় তেমনি ভাবে হেঁটে চলে গেল। হয়ত আড়ালে গিয়ে ও চোখে আঁচল দেবে বাদলের জন্য। অসংখ্য অবয়ব তার চোখের সামনে অর্দ্ধবৃত্ত, ত্রি-কোণ অর্থহীন আলো আর ছায়া হয়ে ঘিরে রইল। মনে হয় কথা সব ফুরিয়েছে—বার বার বলে দেওয়া পুরনো সব কথা।

বাদল সচেতন হয়ে দেখল সে একই জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। সেই অদ্ভুত বাস-স্টপ। অচেনা রাস্তা। সারি সারি উজ্জ্বল দোকান। সে কতক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে আছে তা ভেবে পেল না।

তার মনে হ'ল অনেকক্ষণ ধরে সে একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা হাত একটা গাড়ির জানালায় রাখা আছে। অন্ধকারে গাড়ির ভিতরের অবয়ব দেখা যায় না। রাস্তার জোর আলো শুধু হাতটার ওপর পড়েছে। মনে হয় ঠিক যেন কাটা হাত। সেই হাতে ঘড়ি! এতক্ষণ সে আর কিছু দেখেনি—না গাড়ীটা, না হাতটা, শুধু ঘড়িটাকেই দেখেছে। দুটো কাঁটা একটা নিখুঁত সুন্দর কোণ সৃষ্টি করে আছে। সে অনেকক্ষণ কাঁটা দুটোকে দেখেছে। দেখেছে দুটো কাঁটার তৈরী কোণটা আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে চিকণ থেকে চিকণতর হয়ে গেল। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না ঘড়িতে ঠিক কটা বাজে।

সচেতন হয়ে বাদল ঘড়িতে সময় দেখল। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। মুহূর্তে সে সুধাবিন্দু হয়ে যাচ্ছিল।

যখনই নিজের ওপর নিষ্ঠুর হতে ইচ্ছে করে তখনই সে টের পায় সে সুধাবিন্দু হয়ে যাচ্ছে। বাদল সুধাবিন্দু হয়ে বাদলকে ভাবল ঃ বাদলের এও এক দুঃখরোগ। সে মনে মনে ঘটনা তৈরী করতে ভালবাসে। কিন্তু সেই ঘটনাও সে সুন্দরভাবে তৈরী করতে পারে না। বাস স্টপে একটি মেয়ের ভঙ্গী তাকে আকর্ষণ করেছিল মাত্র। সেই সুন্দর ভঙ্গী থেকে সে যে ঘটনা তৈরী করেছিল তা বাদলকেই আঘাত করেছিল। মেয়েটির নাম সে দিয়েছিল প্রীতিলতা—আশ্চর্য, অন্য কিছু নয়! হয়ত প্রীতিলতা বলতে সে কিছু একটা ধরে নিয়েছিল। মেয়েটি রিফিউজি—বহু পুরুষের সঙ্গ পেয়ে ক্লান্ত—সে মাঝে মাঝে মা বাবার মাঝখান থেকে পালিয়ে আসে। বোঝা যায় প্রীতিলতাও এমন কেউ—যে দুঃখরোগগ্রস্ত। বাদল এর থেকে সুন্দর কিছু যে ভেবে পায় নি তার কারণ হয়ত' সে তাঁর সময় এবং পরিবেশের কাছে শৃঙ্খলিত আছে। সে যে রাজকন্যার কথা ভাবতে পারে না তার কারণও হয়ত তার দুঃখ-রোগ। যেন সে নিজের কল্পনার কাছেও ক্রীতদাস, এবং এমনই অক্ষম যে তার আত্মপ্রতারণাও বেশী দূর যায় না। যেমন সে ভাবে সারা বছর ধরে সে একটি মাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগছে, অথচ সে ভাবতে পারে না যে সে অন্য কিছুতে ভুগেছে। যদি সে বুঝতে পারত সারাবছর সে—তে ভুগছে। নইলে তার মনে হবে কেন যে একটা শুধু হাত—কাটা হাতের মতো—একটা ঘড়ি, দুটো কাঁটার একটা নিখুঁত কোণ—এই সবের কোন অসম্ভব অর্থ আছে। অথচ সারা সময় সে বৃথাই ভাবছিল যে সে হাজার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে, অথচ মনে হয়েছিল চার পাশের দৃশ্য ভীষণ ভঙ্গুর—পলকে পলকে পালটায়!

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

বাদলের ইচ্ছে হ'ল কোথাও যাবে। কিছুক্ষণ সময় কাটাবে। এই ভেবে সে এক বন্ধুর কাছে যাবে বলে হাঁটতে লাগল।

গুহার মতো প্রকাণ্ড ঘর। জানালা নেই, একটা মাত্র দরজা। চারিদিকে ঝুলের মতো চাপা অন্ধকার। একটা হলদে আলো জ্বলছে। শ্বাস টানতে কেমন কষ্ট হ'ল বাদলের। হাতের তাস দেখছিল। বরুণ অনেকক্ষণ হাতের তাস ফেলে শুয়ে আছে। অধীর চুপ। শুধু হিরণ খেলছে।

আবছা শিলালেখ-এর মতো অবয়ব নীচু করে করে হিরণ বলল, 'জোড়া আছে। দুটো বিবি। তোর?'

বাদল অবহেলায় হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলল 'দশের। নিয়ে যা।'

দু' টাকার কিছু বেশী গেল।

'এবার উঠব' ঘরের একটা মাত্র দরজার দিকে চোখ রেখে বাদল বলল।

'বোস্ না।'

'না, অনেক রাত হয়ে গেছে।' বলতে বলতে বাদল দেখল গাছের শুকনো ডালের মতো হাত বাড়িয়ে অমানুষিক ভঙ্গীতে পয়সা গুণল হিরণ—যেন ওর আয়ুর প্রতিটি বছর গুণে নিচ্ছে। অধীর ট্যাক্সি ভাড়া চাইছে, বলল 'ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ভাড়াটা দে।'

উঠতে গিয়ে বাদল হাঁটুর হাড়ে সেই চিন্‌চিনে ব্যথা টের পেল। ব্যথাটা টের পেতেই সে পলকে উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে হিরণকে বলে 'তোর নোট্‌গুলো দিস্। ভাবছি পরীক্ষাটা দেব।'

'কেন?'

'একটা কিছু নিয়ে থাকা দরকার। এ ভাবে চলে না।'

হিরণ কোণাকুণি তাকাল। বাদল ভাবল হিরণ তাকে পছন্দ করে না। মুহূর্তে সে তার সাদা রঙ তার নীল শিরার কথা ভাবছিল।

হিরণ অন্যমনস্ক ভাবে বলে 'ও।'

বাদল নেমে এল রাস্তায়। যখন সে উঠে আসে তখনো অলস একঘেয়ে ভঙ্গীতে আধশোয়া অধীর পুরোটা শুয়ে পড়বার আগে ট্যাক্সি ভাড়া চাইছিল। আর সব চুপচাপ। তখনো বাদলকে ছাড়া ওরা তিনজন। হয়ত' সারারাত চলবে। অধীর সকালের বাস ধরবে। কেননা, জুয়ায় জেতা পয়সা হিরণ খরচ করতে চায় না। বাদলকে রাত্রিবেলা থাকতে কেউ বলেনি। বলবে না, বাদল জানত। নিজেকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত মনে হ'ল বাদলের।

'এ আমার দুঃখরোগ' ভাবতে গিয়েই তার মনে হ'ল কেউ সামনেই কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মোড় ঘুরলেই তাকে দেখতে পাবে। পেছনে তাকিয়ে দেখে ঝুপ্‌সি ঝুপ্‌সি গাছ, রাস্তাটা ভীষণ সোজা—প্রায় জ্যামিতিক, পাথরের মতো কঠিন আলো। কাউকে দেখা যায় না।

বাদল স্থির হয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছিল, যেন কিছু ঘটবে। যা অমোঘ। অথচ সব কিছু স্থির। প্রায় মৃত। যেন সে এক অতি প্রাচীন পরিত্যক্ত শহরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষয় হয়ে যাওয়া সবকিছু। যেন বহু শতাব্দী ধরে এইসব প্রাচীর তারই অপেক্ষায় ছিল।

বাদল অনুভব করে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—খুব কষ্ট। ভয় পেলে যেমন হয়। মনে হল জোর নিশ্বাস ফেললেই চারদিকের পরিবেশে গভীর কিছু একটা নষ্ট হয়ে যাবে। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় না। বহু লক্ষ বছরের মৃত ম্যামথ্‌ প্রাণীদের দেহ প্রাসাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হ'ল সামনেই কোথাও কেউ অপেক্ষা করে আছে। মোড় ঘুরলেই তাকে দেখতে পাবে। অন্ধকারে হাইড্রোজেন ঢাকনা খুলে সে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বহুকাল ধরে সে বাদলের প্রতিটি রাস্তায় গর্ত খুঁড়ছে, অপেক্ষা করে আছে তাকে একা পাবে বলে।

'হয়ত সে আমার নিয়তি, সে আমার ঘাতক' ভাবল বাদল। কে জানে সে হিরণের মতো অমানুষিক ভঙ্গীতে কোথাও অপেক্ষা

করছে কিনা, কিংবা হয়ত সে বাদল নিজেই।

বাদল জুতো ঠুকে ঠুকে হাঁটতে লাগল। ভাবল এ সব কিছুই অর্থহীন। কোথাও কোনদিন তার জন্য অপেক্ষা করে নেই। শব্দ সম্পূর্ণ অন্তঃসারহীন, অর্থশূন্য হয়ে কানে বাজছিল।

বাদল সিঁড়িতে নিজের পায়ে শব্দ শুনল। গতি শ্লথ করে দিল। মনে হ'ল কান পাতলে সে আর একটা পায়ের শব্দও শুনতে পাবে। মনে হয় তার সব রাস্তাতেই কেউ আগে আগে যায়।

বাদল দ্রুত উঠে যেতে গিয়ে দেখল বেড়ালটা বলের মতন সিঁড়ির ওপরে পড়ে আছে। ওর শব্দ শুনবে বলে বাদল লাথি ছুঁড়ল। চিতাবাঘের মতো থাবা ঘুরিয়ে লাফিয়ে বেড়ালটা অন্ধকার থেকে অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল। বাদল মুখ ঘুরিয়ে দেখল বেড়ালটা নেই, শুধু সিঁড়ির পর সিঁড়ি। ক্রমান্বয়। অঙ্কের মতো। মৃদু আলো। স্থির সিঁড়ি। এত স্থির যেন হাজার হাজার বছর একভাবে পড়ে থাকবে। সেই স্থির অচল সিঁড়ির ওপর বেড়ালটার মুহূর্তের বিদ্যুতের মতো দ্রুত স্বচ্ছন্দ বেগ ভাবতে ভাবতে সে স্থির হয়ে রইল। বাদলের মনে হ'ল সে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দেখতে দেখতে সিঁড়ির মতোই কোনো কিছু হয়ে যাচ্ছে! সে স্পষ্ট শুনল তার জুতোর শব্দ তাকে রেখে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরদিকে উঠে যাচ্ছে।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে বাদল টের পেল যে সে নিজেই উঠছে। সিঁড়ি ভেঙে। ক্রমান্বয় অঙ্কের মতো স্থির সিঁড়ি। সে উঠছে। যেন মুহূর্তের জন্য মাত্র সে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। এখন সব ঠিক আছে।

সে ঘরের তালা খুলল। শীতল অন্ধকারে দাঁড়াল।

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

তীক্ষ্ন যন্ত্রণা আলপিনের মতো যেন বিঁধল। ভীষণ দুঃখের সঙ্গে সে টের পেল তার চারিদিকে কেমন অস্বাভাবিক আবহাওয়া।

হয়ত' অচিরেই কিছু ঘটবে। এমন কিছু যা মৃত্যুর মতোই অমোঘ—যা ঘটবেই—ঘটবেই—। হয়ত' মৃত্যুই—! 'যদি মরে যাই?' বাদল ভাবল 'মৃত্যু বড়ো দুঃখময়, মনে হয়।'

নিজের ঘরে অন্ধকারে সে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, টের পেল।

এখন রাত্রি। সবাই ঘুমোচ্ছে। পরিবেশ শবদেহের মতো স্থির। সে যেন একা এই ভীষণ, ভারী পরিবেশকে শববাহকের মতো বহন করেছে।

বাথরুমের কল খুলতে গিয়ে বাদল শিউরে উঠলো। কলের চাবিটা তীক্ষ্ন হুক্-এর মতো চক্ চক্ করছে। মেঝেটা জলে পিচ্ছিল, শ্যাওলা জমে আছে। 'যদি পড়ে যাই' ভাবল 'হয়ত আমার একটা চোখ চাবির ওপর পড়বে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দেখবে আমার চোখটা বিচ্ছিন্ন হয়ে কলের চাবিটার সঙ্গে আটকে থেকে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি সেই চোখটা তুলে নিতে গিয়ে আবার আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি সেই চোখটা তুলে নিতে গিয়ে আবার আমার অন্য চোখ। তারপর কি ভীষণ অস্তিত্বহীনতা—কিছু নেই—কিছু লেই—।'

'যদি মরে যাই?' বাদল ভাবল 'এইখানে এখন আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। অথচ মা জানে আমি আছি—আছি—যতক্ষণ খবর না যায়। এইখানে আমার কাছে আমি নেই, অথচ ওইখানে মার কাছে আমি আছি।'

'কি ভীষণ দুঃখময় সবকিছু' সে ভাবল 'কি ভীষণ দুঃখময়। যদি মরে যাই তবে তার আগে আমি কোথাও খুব দূরে চলে যাবো। তারপর একদিন আমি ক্লান্ত এক বালকের মত ঘুমাবো!'

অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোলো না। বসে বসে পড়ল। সারাক্ষণ সে ধুলো আরশোলা আর ইঁদুরের গন্ধ পেল। যেন

ঘরটা বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত। সারাক্ষণ ভাবল খুব কাছেই ঘাতকের মতো কেউ অপেক্ষা করে আছে—মুহূর্তেই মৃত-পরোয়ানা বের করে দেখাবে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তার মনে হ'ল সারা রাত সে যেন কার অপেক্ষায় ছিল। সারাটা রাত।

এখন একটু শীত পড়েছে। আজকাল সকালে বাইরে তাকালে কুয়াশা দেখা যায়। বাদল সকালবেলা চুপচাপ শুয়ে কুয়াশার গন্ধ পাচ্ছিল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। বাদল শরীর নাড়ল না। এই ক্লান্তি কিসের তা জানবার জন্য বাদল সুধাবিন্দু হয়ে বাদলকে ভাবছিল ঃ শীতকালের গোড়ার দিকেই বাদলের শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে হয় বাদল জানতো এমনি কিছু হবে। সারাক্ষণ সে ঘরে থাকে, বাইরে যায় না। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে পরীক্ষা দেবে বলে। বই মুখে করে বসে থাকে—হয়ত' পড়ে, হয়ত' পড়ে না। আমার মনে হয় সে সব সময় তার চারিদিকের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করে। কেননা, কখনো তার দিন অতি দ্রুত লয়ে কাটে। এত দ্রুত যে সে কিছু বোঝে না। দেখতে না দেখতেই যেন ধাবমান গাড়ীর জানালা দিয়ে সরে যায়। কখনো তার দিন অতি ধীর লয়ে কাটে। এত ধীর যে সহ্য করা যায় না। এইসব ধীর দিনে তার কাছে নিজের দেহকে বহন করা কি কঠিন মনে হয়? একদিন তার বন্ধু হিরণ এসে বলেছিল 'কিছুতেই পড়তে পারছি না, রাত্রে ভীষণ ঘুম পায়, কি করা যায় বলতো?' বাদল প্রায় চমকে উঠে কিছু বলতে গেল। বলল না। বরং বলা যায় বলতে পারল না। কারণ সেইক্ষণে তার মনে হয়েছিল যে যার দুঃখরোগ হয়নি সে কখনোই বুঝবে না কি করে সে সারারাত জেগে থাকে। কিংবা হয়ত' এও এক ধরনের ভয় বাদলের। সে বলল না যে সাধারণত কোন অমোঘ—যা হবেই—এমন কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকি বলে আমার ঘুম আসে না। যেন সারাক্ষণ সে কিছুর জন্য অপেক্ষা করে আছে। জন্মের পর থেকেই যেমন

সে জানে মৃত্যু অমোঘ—যেমন কিছু। হয়ত মৃত্যুই। মনে হয় এই ধরনের আত্মমগ্নতায় সে অবিরত ভোগে।

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

বাদল সুধাবিন্দু হ'য়ে ভাবল : সারাদিন শুয়ে আছে। কেন যেন মনে হয় প্রবল জ্বরের ঘোরে সে রয়েছে। তার শীর্ণ দেহ দেখলে মনে হয় বহু কষ্টে দীর্ঘ দিন বেঁচে আছে। নিজের দেহকে বহন করা কি কঠিন তা বাদলকে দেখলে বোঝা যায়। যেন সারাক্ষণ তার চোখের পাশে সমস্ত পরিবেশ, সব অবয়ব শুধু অচেতন দীর্ঘরেখা, অর্দ্ধবৃত্ত, ত্রি-কোণের মতো অর্থহীন আলো আর ছায়া হয়ে ঘিরে আছে। সে জানে না এইসব অস্তিত্বের অর্থ কি, যেমন তার গভীর সংশয় সে আছে কিনা। কিংবা কতটুকু আছে? শুয়ে শুয়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনে। কেউ ধীর মন্থর পায়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে উঠে যায়। আবার নামে। ছেদহীন ক্রমান্বয় তার আনাগোনা। সারাদিন কেউ যেন কাজ নিয়ে আছে। চোখ বুজে থাকে। তার ভয় কেউ বুঝি আসে। দরজায় টোকা দেবে কেউ—সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচেছ কিংবা নামছে। সারা-দিন শুধু পায়ের শব্দ শোনে। কারা এল ঘুরল ফিরল চলে গেল! কেউ যেন তার ঘরের কুঁজোটায় জল ভরে রেখে গেল। একটা আলো আঁধারির মধ্যে দিন কেটে যায়। বেলা গড়িয়ে যায় আস্তে আস্তে। বাদল ওঠে না।

বাদল বাদলের জন্য দুঃখ পাচ্ছিল। যেন যে কোন মুহূর্তে মৃত বাদলের জন্য বাদল শোকে আর্তনাদ করবে।

বাদল দেয়াল ঘেঁষে বসে দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা দাগ দেখছিল। খয়েরী একটা দাগ—মোটা পেন্সিলের দাগের মতন। প্রথমে বাদল ভেবে পেল না দাগটা কিসের। তারপর তার মনে পড়ল। কবে যেন বিছানা থেকে একটা ছারপোকাকে খুঁটে এনে সে দেয়ালে পিষে মেরেছিল।

'এখন শুধু দাগ মাত্র' বাদল মনে মনে বলল 'কিছু চেনা যায়

না।' প্রায় অস্তিত্বহীন হাল্কা দাগটার দিকে চেয়ে থাকে।

একটা আঙুল তুলে বাদল দাগটার ওপর রাখে। মসৃণ। দেয়ালের সাথে সমতল—যেন এখানে কারো কিছু নেই শুধু দেয়ালটা ছাড়া।

বাদল দাড়ি কামানোর সাবান থেকে গুঁড়ো তুলে দাগটার ওপর লাগিয়ে দিল।

এখন দাগটাও নিশ্চিহ্ন।

সুধাবিন্দু হয়ে বাদল ভাবছিলঃ বিকেলের দিকে বাদল সেই দাগটার কথা—কি আশ্চর্য ভুলে গেল। যেন ওইখানে কিছু নেই —নেই—। কিছু ছিল না।

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

নিজেকে ভীষণ অবান্তর মনে হ'ল বাদলের। যেন অণু-পরমাণু হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে বাদল। বাদলের জন্য বাদল দুঃখ পেতে লাগল।

জোর করে পড়তে লাগল বাদল। বুঝতে পারল না সত্যিই সে পড়ছে কিনা।

পরীক্ষার হলে বসে বাদল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বুঝতে পারল সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে।

রাস্তার ওপাশে একটা লাল রঙের বাড়ীর ছাদ। সে ছাদ দেখছিল। তার মনে পড়ল না এই ছাদটা সে আগে কখনো দেখেছে কিনা। কিন্তু তার মনে হ'ল ছাদটা ভীষণ জরুরী।

সে চারধারে তাকাল। সবই মাথা নীচু করে আছে। প্রায় স্থির। যেন শোকে স্তব্ধ হয়ে ওরা কারো মরে যাওয়া দেখছে। কিছু করার নেই। সে মনে করতে পারল না এদের সে কোথাও কখনো দেখেছে কিনা। তার মনে হ'ল সে সারা জীবনে কোটী কোটী মানুষ দেখেছে যাদের মুখ অবিকল একরকম। এরা ভীড় করে বাসে উঠে বাস থেকে নেমে উজ্জ্বল সারি সারি দোকানের

পাশ দিয়ে নিজেদের ছায়াযুক্ত জ্যামিতিক অর্থহীন অবয়ব নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার নামে। অর্থহীন সবকিছু।

বাদল আবার ছাদের দিকে তাকাল। 'ওই তো বাদল'—বাদল চমকে উঠে দেখল ছাদের ওপর—স্পষ্ট পরিষ্কার বাদল—প্রায় অস্তিত্বহীন—জ্যামিতিক আণবিক বাদল—রোদ কিংবা বাতাসের মতো—ত্রি-কোণ, অর্দ্ধবৃত্ত, দীর্ঘ-রেখার মতো বাদল—অর্থহীন—!

বাদল দ্রুত খাতা টেনে নিল। শেষ বারের মতো—ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার আগের মুহূর্তে কিছু বলে নেওয়ার মতো—সে ভাবল কাউকে কিছু জানানো ভীষণ প্রয়োজন।

সে দ্রুত লিখতে লাগল: আমি বাদল। আমি ছিলাম। অথচ আছি কি নেই জানি না। যদি আমার একটা ঘেরা দেওয়া বাগান থাকত আর একটা বাড়ী—আমি সব কিছু থেকে এদের আলাদা করে নিতাম। যদি নেওয়া যেতো আমি প্রীতিলতার কয়েকটা ভঙ্গী সমস্ত প্রীতিলতার কাছ থেকে আলাদা করে নিতাম। তারপর আমি যাদের ভালবাসি—যা ভালবাসি—তাই নিয়েই এই অবেলাগুলো কাটিয়ে দিতাম। কয়েকটাই তো মাত্র দিন—গুণতে গুণতে কেটে যেতো। দুঃখময় সবকিছু—সব কিছু—মনে হয়—তারপর একদিন তীর খাওয়া পাখীর মতন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলতে পারতাম এই ছিল আমার জীবন। আমি কি সুখেই না ছিলাম। মৃত্যু বড় দুঃখময় মনে হয় দুঃখময় দুঃখময় সব কিছু মনে হয়, তাই শেষ বারের জন্য আর উঠবো না জেনে লুটিয়ে পড়ে বলতে পারবোনা এই ছিল আমার জীবন। বলতে পারি না আমার ভাগে আমি কিছু আলাদা পেয়েছিলাম। বলতে পারি না আমার ভাগে যা ছিল আমি তার সবটুকুই পেয়েছিলাম। কে যেন আমাকে বলেছিল তুমি আমাকে সবটুক পাবে না—আমি গাছের মতন একটা শিকড় দিয়ে তোমাকে ছুঁয়েছি, অন্য শিকড় দিয়ে অন্য কাউকে, আজ তোমার কাছে আছি কাল অন্য কারো সাথে থাকব ক্ষণভঙ্গুর চিত্র সব দুঃখময়, কতটুকু আছি জানি না। এ সব

কিছুই খুব দুর্বোধ্য আমি নিজেই তার কতক বুঝি না বুঝতে পারি না জানি না—

বাদল 'জানি না' শব্দটা দু'বার লিখল। শব্দটা ভীষণভাবে তাকে আকর্ষণ করছিল। সে বারবার লিখল 'জানি না জানি না জা জা জা নি নি নি না না না।' দেখল লেখাটা বিশ্রী হয়ে গেছে। লেখাটাকে তুলে ফেলবার জন্য সে আঙুল দিয়ে ঘষল।' কালিটা লেপ্‌টে একটা লম্বা দাগ হয়ে গেল।

ভীষণভাবে চমকে বাদল দাগটাকে দেখল। তারপর পরের লাইন লিখল ঃ কি ভীষণ অসম্ভব একটা দাগ হয়ে যাওয়া সবকিছু নিয়েও শুধু একটা দাগমাত্র হয়ে যাওয়া বিকেলেই বাদল যে দাগটার কথাও আশ্চর্য ভুলে যাবে—

'শুনছেন ?'

ছেলেটি চমকে মুখ তুলল। বাদলের দিকে তাকাল। বলল, 'কিছু বলছেন ?

'দেখুন আমার মনে হয় ওই ও পাশের ছাদে দাঁড়িয়ে কেউ আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।'

ছেলেটি আবার খাতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বলল—আপনি গার্ডকে বলুন।

সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় বাদল, চীৎকার করে বলে—শুনুন! আপনারা শুনুন!

বুড়োমতো, চশমাপরা গার্ড ছুটে আসে—চুপ করুন।

বাদল চীৎকার করে তবু বলতে থাকে—আমি লিখতে পারছি না। আপনারা দেখুন ঐ পাশের ছাদে ওখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ও অনেকক্ষণ ধরে ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। লিখতে দিচ্ছে না।

আশুতোষ বিল্ডিংসের দক্ষিণের জানালা দিয়ে মেডিকেল কলেজের ছাদ দেখা যায়। সেখানে কেউ নেই। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখেশুনে গার্ড বলে—কেউ নেই তো।

—নেই? বাদল হতাশা এবং আক্রোশের গলায় বলে—নেই কী? আমাকে কখনো কোনো কাজ করতে দেয় না। ওর জন্যেই আমার কিছু হচ্ছে না। কেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না ওকে? ঐ তো ও দাঁড়িয়ে আছে, ঐ তো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! ভাল করে দেখুন!

আশপাশের ঘর থেকে লোকজন ছুটে আসে। দু একজন ছেলে উচ্চকণ্ঠে ধমক দেয়—ডিসটার্ব করবেন না।

গার্ডরা এসে বাদলকে ঘিরে ধরে। বুড়োমতো সেই লোকটা বাদলের হাত ধরে বলে—আপনি বাইরে আসুন। এটা পরীক্ষার হল, চেঁচালে সকলের অসুবিধে—

বাদল ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—কেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না? কেন? দিনের পর দিন কেন ও আমার পিছু নিয়ে ঘুরবে? কেন? কেন আপনারা আমাকে চুপ করতে বলছেন?

বাদলের চারধারে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর চীৎকার করে বলে—চুপ করুন। চুপ করুন। চুপ করুন।

বাদল তার চারধারে তাকিয়ে সহস্র মুখ দেখে। ক্রমে সেই সহস্র মুখ তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে একই রকম সব মুখ হয়ে যেতে থাকে। তারপর অস্পষ্ট আবছা কতগুলো বৃত্তাকার দাগ মাত্র হয়ে যায়। সে সেই দাগগুলোর দিকে চেয়ে চীৎকার করতে থাকে—আমি চিরকাল কেন চুপ করে থাকবো? কেন? আমার কিছু বলার নেই? বলতে বলতে বাদলের চোখে জল আসে, সে কাঁদতে থাকে—কেন আমার কিছু বলার থাকবে না? কেন আপনারা আমার কথা শুনবেন না? শুনুন, আমার অনেক কথা বলার আছে, আমি আজ সব বলতে চাই—

কিন্তু সেই সময় তাকে কেউ দেয় না। কয়েকটা হাত এসে তাকে ধরে তারপর টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বাদল চীৎকার করে আক্রোশে, অনুনয়ে, রাগে—ছেড়ে দিন! আমার কথা শুনুন।

একজন কেউ দয়া করে আমার কথা শুনুন !

বারান্দায় নিয়ে তার মাথায় জল ঢালে কারা। চোখে জলের ছিটে দেয়। বাদল চীৎকার করতে থাকে। জল লাগা চোখে চতুর্দিকের অস্পষ্ট ভাঙাচোরা, অবাস্তব দৃশ্য দেখে। একজন, কেউ একজন কোথাও কি নেই যে বাদলের সমস্ত প্রলাপ ও অবান্তর কথাগুলি শুনবে ! যদি তেমন কেউ থেকে থাকে তবে বাদল এখন বুক উজাড় করে ঢেলে দিত কথার রাশি, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত এক দীর্ঘ ঘুমে। বহুকাল জাগতনা আর। সে প্রাণপনে হাতগুলো ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। চীৎকার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু স্বর তেমন ফোটে না। হতাশ বাদল বিড়বিড় করে কী যেন বলেঃ কাকে যেন ঠিক বোঝা যায় না।

তারপর সে টের পায় তাকে একটা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে কোথায় যেন নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ভাগের অংশ

ছাইদানীতে একটা বিড়ির টুকরো দেখে দীপ্তিময় তার বৌ রমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—'কে এসেছিল বল তো। বিড়ি খায় এমন লোক কে!'

রমা বলল, 'তোমার ফুলকাকা। তুমি অফিসে যাওয়ার একটু পরেই এসেছিল, বলে গেছে আবার আসবে কয়েকদিন পর।'

'ফুলকাকা!' ভ্রূ কুঁচকে ফুলপ্যাণ্টের বোতাম খুলতে খুলতে দীপ্তিময় বলল,-'কই, ফুলকাকা বলে কেউ ছিল এমন তো মনে পড়ছে না! কেমন লোক?'

রমা একটু মুশ্কিলে পড়ল, ইতস্ততঃ করে বলে—'বলল তো আমি দীপুর ফুলকাকা, তোমার ওরকম কাউকে মনে পড়ছে না?'

মাথা নাড়ে দীপ্তিময়—'ফুলকাকা বলে কেউ ছিলই না। লোকটাকে কেমন দেখতে?'

'রোগা, বুড়ো, গরীব। মনে রাখার মতো চেহারা নয়, রাস্তার ভীড়ে আবার দেখলে চিনতেই পারবো না।'

আশ্চর্য! কিছু নিয়ে টিয়ে যায়নি তো! লোকটা চলে যাওয়ার পর ঘর টর ভাল করে দেখেছো?'

রমা বলে—'বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়ার মতো জিনিস আর কিই বা আছে! মিনিট কুড়ি ছিল মাত্র, তাও ঐ ঘরেই। বলল বৌমা চা খাওয়াও।'

'খাওয়ালে?'

'খাওয়াবো না কেন! চা আর বিস্কুট দিলাম।'

'আর কিছু চাইল না?'

'চাইল আট আনা পয়সা।'

'দিলে ?'

'দিলাম। গরীব মানুষ। বলল রাস্তাখরচ নেই, হালতু থেকে এই উত্তরপাড়া পর্যন্ত এসেছে তোমার খোঁজ করতে। দিয়ে দিলাম আট আনা।'

দীপ্তিময় সামান্য অন্যমনস্ক থাকল, তারপর বলল—'সাবধানে থেকো। আমাদের চারপাশে অনেক ফুলকাকা। অচেনা লোককে হুট্ করে ঘরে ঢুকতে দিও না।

রমাকে লোকটা ঠকিয়ে গেছে এমনটা রমার মনে হচ্ছিল না। সে বলল——'দেখ লোকটা যে তোমার আত্মীয় নয় তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। সে তোমাদের বাড়ির অনেকের নাম জানে, চেনে। সেজ ভাসুরের সঙ্গে এক কলেজে পড়েছে, তখন তোমাদের ঢাকার বাড়িতেও গেছে অনেকবার। বলল তোমাকে ছোট্ট দেখেছিল। নানা কথার মধ্যে এও বলল যে তোমার কোমরে একটা ফোঁড়া অপারেশন হয়েছিল ছেলেবেলায়। সে সময়ে উনিই তোমাকে কোলে করেছিলেন, আর পুঁজে রক্তে তার জামাকাপড় ভরে গিয়েছিল।'

ঘরে পরার পায়জামাটা কোমর পর্যন্ত টেনে দড়ি আটকাতে দীপ্তিময়ের হাত থেমে রইল, বলল—'আশ্চর্য! তবে কি আমারই ভুল হচ্ছে। ঢাকায় আমি জন্মের পর তেরো চোদ্দ বছর কাটিয়েছি, কাজেই সব ভুলে যাওয়ার কথা নয় রমা। কিন্তু ফুলকাকা যে কে কিছুতেই মনে পড়ছে না তো! সেই ফোঁড়া কাটার দাগ দেখ না, এখনো কোমরে আছে।'

'আমি তো জানি।' রমা বলল।

'লোকটা ঠিকই বলেছে। অথচ আমার তো মনে পড়ছে না ওরকম কাউকে।'

রমা এবারে হাসল 'আমি খুব বোকা বোকা ভালমানুষ তো নই। কাজেই যাকে তাকে বিশ্বাস করি না। এ লোকটা ঠিক জোচ্চোর হতে পারে, তবে তোমাদের চেনে ঠিকই। বলে গেছে

আবার আসবে, যদি আসে তবে হয়তো সামনাসামনি দেখলে তুমি চিনতে পারবে।'

'এসেছিল কেন ?'

'ঠিক বুঝলাম না। হাবভাব দেখে মনে হল কোনো মুস্কিলে পড়েছে। হয়তো তোমার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে পারে। আমার কাছে আট আনার বেশী চায়নি।'

দীপ্তিময় আবার ভ্রূ কোঁচকাল। সাহায্য করতে করতে জীবন গেল। পথে ঘাটে অফিসে ঘরে সব জায়গায় কেবল হাত-পাতা মানুষ। ভাল লাগে না!'

'তোমার আছে বলেই মানুষ চায়।'

কথাটা বলেই রমা একটু হাসল। দীপ্তিময় তার শ্যামলা মিষ্টি চেহারার বৌটির দিকে তাকিয়ে একটা কিছু বলবে বলে ঠিক করছিল, তখনই রমা 'তোমার চা টা নিয়ে আসি' বলে চলে গেল।

তখন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসল দীপ্তিময়। রোজই বসে। তারপর চা খেয়ে হাতমুখ ধোয়, তারপর আবার চা খাবার খায়। বসে দীপ্তিময় রমার কথাটাই একটু একটু ভাবল। তোমার আছে বলেই মানুষ চায়। অর্থাৎ রমা—তার বৌও লক্ষ্য করেছে যে তার অনেক আছে! ভেবে একটু শ্বাস ছাড়ে সে। আছে যে সেটা মিথ্যে নয় আবার খুব বলার মতোও কিছু না। যা আছে তার সবটুকুই কি সে উপার্জন করেনি? হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, একরোখা ধৈর্য অধ্যবসায়—এ সবের মূল্যেই সে যা কিছু অর্জন করেছে। তাও সেটা খুব বেশী কিছু না। তবে একথা ঠিক যে, সে একটু তাড়াতাড়ি টাকা করেছে, যেটা পারেনি তার অন্য বন্ধুরা। আত্মীয়েরাও গরীব রয়ে গেছে। অথচ মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই সে উত্তরপাড়ায় একটি সুন্দর বাড়ির মালিক। কলকাতার ওপরে কিছু জমি কিনল কয়েকদিন আগে রমার নামে, নতুন একটা বীমাও করেছে সে। আরো অনেক কিছু করার স্থির একটা লক্ষ্যও আছে তার। সময়ে সব হবে সে জানে। এসব নিশ্চয়ই রমারও স্বস্তির

কারণ। তবে কেন রমা লক্ষ্য করেছে যে তার অনেক আছে!

দীপ্তিময় সহজে রাগে না, উত্তেজিত হয় না। তার স্বভাব ঠাণ্ডা, সে ধৈর্যশীল। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘোর যৌবনেও মান-অভিমানের খেলা খুব কম হয়েছে। কম হয়েছে দীপ্তিময়ের জন্যই। কেননা সুখে থাকা, আর সাফল্যের ব্যাপারটা নিয়েই তার সব ভাবনা চিন্তা। অনেক সময়েই রমার সূক্ষ্ম ভাবপ্রবণতাগুলো সে এড়িয়ে গেছে। আজও এড়াতে পারতো। কিন্তু ফুলকাকা পরিচয় দিয়ে যে লোকটা আজ এসেছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রমা বড় সহৃদয় হয়ে পড়েছিল। লোকটা নির্লজ্জের মতো চেয়ে চা খেয়েছে, পয়সা নিয়ে গেছে, তবু তার প্রতি একটু রাগ নেই কেন রমার?

তাই রমা চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে যখন ঘরে ঢুকল তখন রমার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইল দীপ্তিময়। রমার মুখ নির্লিপ্ত, চায়ের কাপে মনোযোগী চোখ, সংসারে নানা কাজের চিন্তায় সে অন্যমনস্ক। চা দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে রমাকে সে ডাকল—'শুনে যাও একটা কথা।'

'কি!' বলে রমা চৌকাঠ থেকে ফিরে তাকায়!

'তুমি কি কমিউনিষ্ট?'

একটু থতমত খেয়ে রমা হেসে ফেলল। 'ও কি কথা! কেন গো?'

দীপ্তিময় একটু সামলে গেল, বলল 'না! এমনিই, তুমি কাজে যাও।'

'আচ্ছা মানুষ! আমি কমিউনিষ্ট হতে যাবো কেন! ওসব কি আমি বুঝি?'

'ঠিক কথা। বড়লোকের বৌয়ের ওসব হ'তে নেই।' বলে দীপ্তিময় হাসে। সরল অকপট হাসি।

রমা দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর হঠাৎ বলে 'বাড়ির মঙ্গলের জন্য মানুষকে দিতে থুতে হয়। নইলে শাপ লাগে।'

রমা একথা বলেই চলে গেল।

দীপ্তিময় জানে রমা বুদ্ধিমতী। হয়তো রমা তার প্রশ্নটার নিহিত উদ্দেশ্য আন্দাজ করে নিয়েছে। চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে চোখের সামনে কাপটা একটুক্ষণ ধরল দীপ্তিময়, ঠিক মাঝখানে ছোট্ট এক বিন্দু ফেনাকে ঘিরে একটু ঘূর্ণী। এক কণা সর ভাসছে। অন্যমনে দীপ্তিময় চেয়ে থাকে।

*　　*　　*　　*

পরদিনটা ছুটি।

দীপ্তিময় তার সাত বছরের মেয়ে বুবুন আর ছয় বছরের ছেলে পিন্টুকে নিয়ে সকাল থেকেই বাগানের কাজে লাগল। প্রায় দশ কাঠা জমি নিয়ে বাড়ির ঘের। সবটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে ঋজু ঋজু নারিকেল আর সুপুরির চারা, চারটে আম, দুটো কাঁঠাল, একটা নিম দুটো পেয়ারার গাছ। তা ছাড়াও ছুটকো গাছ অনেক, আর আছে সুন্দর সব্জির ক্ষেত। শীতকাল বলে মুলো পালং মটরশাক কপি আর লাউয়ের মাচার চারপাশে উজ্জ্বল সবুজ আলো হয়ে আছে। এসব দেখাশোনা করার জন্য দুজন লোক আছে। দীপ্তিময়ের বাগান তারা দেখে, দুটো গরুর দেখাশোনা করে, গোয়াল পরিষ্কার রাখে। দীপ্তিময়রা বাগানের সব্জি খায় বারোমাস, ঘরের গরুর দুধ খায়। এর জন্য দীপ্তিময়ের বড় তৃপ্তি।

বুবুন আর পিন্টু ইচ্ছেমতো চারাগাছ লাগাল খানিকক্ষণ, এখানে ওখানে মাটি খুঁড়ল, জল দিল, তারপর দুজনে চোর চোর খেলতে খেলতে গাছপালার মধ্যে চলে গেল কোথায়। দীপ্তিময় তার দুজন মাইনে করা লোকের সঙ্গে বাগান দেখল ঘুরে ঘুরে। দেখল গোয়ালঘরের চালের ওপর সেই শীতে লকলকিয়ে উঠেছে তেজ লাউডগা। সবুজ পদ্মফুলের মতো পাতাগুলো উত্তুরে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দীপ্তিময় দেখল বড় বেশী বাড়ন হয়েছে গাছটার, ফলন ভাল হবে না। দা হাতে দীপ্তিময় ডগা কাটবার জন্য চালের ওপর উঠল। তারপর মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল তার দশ কাঠা

জমিওয়ালা সুন্দর বাড়িটার দিকে। দক্ষিণমুখো বাড়ি তার, সামনের বারান্দা লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা, বড় জানালাওলা চারখানা মাঝারি ঘর, দোতলা হবে বলে ছাদের ওপর উঁচু হয়ে আছে লোহার শিকের গুচ্ছ। একদিন দোতলা হবে—যখন তার সংসারে লোক বাড়বে। অবশ্য আপাতত লোক বাড়বার সম্ভাবনা নেই দুটো বাচ্চা আর রমা, আর বুড়ি বিধবা মা। রমা আর ছেলেমেয়ে চায় না। দোতলাটা এখনো অনিশ্চিত। বয়স যখন বাড়বে তখন ওখানে একটা দুটো ঘর করবে দীপ্তিময়। আর থাকবে অনেকখানি খোলা জায়গা। ইজিচেয়ারে শুয়ে দীপ্তিময় অনেকদূরে চেয়ে থাকবে। দীপ্তিময় বাগানের দিকে চোখ ফেরাল গাছগাছালিতে কেমন নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার বাগান পাখি-পাখালীর ডাক শোনা যায়, আর পোকা ওড়ার শব্দ। নিম গাছের উঁচু ডালে চাক গড়ছে মৌমাছি। গোয়াল ঘরের চালে সতেজ লাউডগা আর পাতার মধ্যে বসে দীপ্তিময় এক রহস্যময় আনন্দকে টের পেল। বাইরের দিকে দেয়ালের পাশ ঘেঁষেই রাস্তা সেদিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় লোকজন হেঁটে যাচ্ছে, মানুষজনের চোখের আড়ালে দেয়ালঘেরা তার সুন্দর বাড়ি আর বাগান বড় তৃপ্তি। বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা করে নিয়েছে নিজের ছোট্ট একটু আলাদা পৃথিবী। এ সবই তার। তার নিজের ঐ বাড়ি, ঐ গাছগাছালি, ঐ পাখী কিংবা মৌমাছি এরা সবাই তার আপন, নিজস্ব। দেয়ালের ওপাশে মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে ওরা বাইরের মানুষ, দূরের। দীপ্তিময় চেয়ে চেয়ে দেখল অনেকক্ষণ। তারপর পিন্টু ছুটে এসে নীচে থেকে দুহাত বাড়িয়ে চীৎকার করে বলল, 'বাবা, আমি চালে উঠবো-ও-ও। আমাকে তুলে নাও।' দীপ্তিময় হেসে ডগাপাতা কেটে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—'মায়ের কাছে রান্না ঘরে নিয়ে যাও। মাকে বোলো বাবা বলেছে মুগের ডাল ছড়িয়ে রান্না করতে।'

কাঁঠাল গাছের তলায় পরিষ্কার জায়গায় একখানা চেয়ার

পাতা। তার ওপর খবরের কাগজ। দীপ্তিময় বসে কাগজ খুলল। কিন্তু পড়ল না। চেয়ে রইল। বাড়িখানা আর একটু বড় হলে একটা পুকুর কাটত দীপ্তিময়, মাছ ছেড়ে দিত। আরো গোটা দুই ছেলেমেয়ে হলে বাড়িটা আরো একটু জমজমে হত। কত কিছু চিন্তা যে মাথার মধ্যে সারাদিন আসে যায়। দীপ্তিময় স্বপ্ন দেখে। কলতলার পাশে বাঁধানো গোল চত্বরে থালায় বড়ি শুকোতে দিয়ে খর রোদে জবুথবু হয়ে মা বসে আছে। সাদা ঘোমটায় মুখ ঢাকা। মায়ের সঙ্গে আজকাল আর ভাল করে দেখা সাক্ষাৎ হয়ই না, কথাবার্তাও হয় খুবই কম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে অনেক। কথাবার্তারও তাল থাকে না। মাকে দেখছিল দীপ্তিময়। সারা শরীর সাদা থানে ঢাকা। মুখ দেখা যায় না। হঠাৎ তার খেয়াল হল মাকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় ফুলকাকা নামে কাউকে মা চিনত কিনা। যদিও দীপ্তিময় জানে যে মা চিনবেন না। তার বড় দাদা মঙ্গলময় কাঁচড়াপাড়ায় থাকে, মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যায়, মা তাকেও প্রথমটায় ভাল চিনতে পারে না। এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি তার, কিন্তু মা বাড়ির কোনকিছুই ভাল করে দেখে না। ভ্যাবলা চোখে চেয়ে থাকে।

বুবুন এসে চা দিয়ে গেল। দীপ্তিময় চা খেতে খেতে ভাবল, ফুলকাকা যদি তাদের পরিবারের চেনা কেউই হবে তবে সে এসে মায়ের খোঁজ করেনি কেন? তাদের দেশের লোকের এটাই পুরানো স্বভাব, সকলের খোঁজ নেওয়া, চেনা জানা আত্মীয়দের খুঁজে বের করা। লোকটা মার খোঁজ নেয়নি, নিলে রমা তাকে বলত। তার মানে খোঁজ খবর নিতে লোকটা আসে নি। অন্য মতলব। ভেবে বিরক্ত হল দীপ্তিময়। মতলববাজ লোকদের সে পছন্দ করে না। রমা হয়তো ভাবে যে, সে অসম্ভব হিসেবী, লোভী কিংবা কৃপণ। কিন্তু দীপ্তিময় জানে যে, সে অদয়ালুও নয়। সে সাধ্যমতো ভিক্ষে দেয়, লোকে বিপদে আপদে পড়লে দেখে, অনেক চেনা জানা লোক এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেয়। কিন্তু সে কখনো ঠকে যেতে চায় না। রমাকে বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই

করতে হয় না বলেই বোধ হয় এ সব সে ঠিক বোঝে না।

*　　　*　　　*　　　*

দুপুরে খেয়ে একটু ঘুমিয়েছিল দীপ্তিময়। বুবুন এসে ডাকল, 'বাবা ওঠো তোমাকে একজন ডাকছে।' দীপ্তিময় জেগে দেখল বেলা পড়ে এসেছে। প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। দুপুরে ঘুমোলে শরীর ভাল লাগে না। তারও শরীর অবশ লাগছিল। উঠে চোখে মুখে জল দিল দীপ্তিময়। রমা উঠোনের তার থেকে জামা-কাপড় তুলছে। তাকে বলল দীপ্তিময় 'চা করো। বাইরে লোক এসেছে।' 'বাইরের ঘরে এসে দেখল আলো জ্বালানো হয় নি। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে চমৎকার অদ্ভুত লাল একটা আলো এসে ঘরে পড়েছে। ঘরখানা যেন জ্বল্‌ছে সে আলোয়। দরজার দিকে পিঠ করে কুঁজো হয়ে বসে আছে একজন লোক, তার ঘাড়ে চাদর হাতে লাঠি। মুখোমুখি হতেই দীপ্তিময় দেখল লোকটার চোখে ঘরের লাল আলোর আভা পড়েছে। রাঙা দেখাচ্ছে দুখানা খুদে চোখ। ভাঙা চোয়ালে সদ্য দাড়ি কামানোর চকচকে ভাব, অযত্নের গোঁফ শুঁয়ো পোকার মত দেখাচ্ছে। পাতলা নাক-খানা একটু বাঁকা, মাথায় অনেক কাঁচাপাকা চুল। সেই চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। গায়ে সাদা সার্ট, পরনে ধুতী। লোকটার বয়স পঞ্চাশ আর ষাটের মাঝামাঝি। মুখে দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তার ছাপ। কিন্তু তাকানোর ভঙ্গীতে কোনো বিনয় বা দীনতা নেই। দীপ্তি-ময়কে দেখে সোজা হয়ে বসল—'তুমি দীপু, না?'

দীপ্তিময় বলল হ্যাঁ, 'আমি দীপ্তিময়।'

দীপ্তিময় লক্ষ্য করল লোকটার হঠাৎ সোজা হয়ে বসার মধ্যে একটা তেজের ভঙ্গী আছে। এককালে লোকটি খুবই দাম্ভিক আর দাপুটে ছিল। এখন হয়তো সংসারের নানা ধাক্কায় খানিকটা দুর্বল হয়ে গেছে।

লোকটি হেসে বলল 'আমাকে তোমার মনে নেই। এক সময় তোমাদের ঢাকার বাড়িতে আমি যেতাম। তোমরা আমাকে

ফুলকাকা বলে ডাকতে।'

একটু অবাক হল দীপ্তিময়। ফুলকাকা বলতে যে মাগুনে চেহারার একটা লোককে ভেবে রেখেছিল সে, এ ঠিক তেমন নয়। যদিও রোগা, বুড়ো, এবং চেহারা আর পোশাকে বেশ গরীব, তবু রমার বর্ণনার সঙ্গে অনেকটা তফাৎ তার চোখে পড়ল। তফাৎটা কী বা কেমন তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তবু আছে। লোকটাকে ভাল করে দেখার জন্য সে বাতি জেবলে দিল। মুখো-মুখী বসল। তারপর বলল, রমা—আমার স্ত্রী বলছিল। কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আমার নাম হুরেন গাঙ্গুলি। 'তোমার জ্যাঠতুতো দাদা রতনের সঙ্গে আমি জগন্নাথ কলেজে কিছুদিন পড়েছি। তখন স্বদেশী যুগ, তাই আমার বেশীদূর পড়া হয় নি।'

লোকটা গাঙ্গুলি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জেনে দীপ্তিময় একবার ভাবল, উঠে একটা প্রণাম করবে কিনা। তারপর দ্বিধায় পড়ে বসেই রইল। লোকটাকে সত্যিই মার মনে নেই। সে বলল, 'সেজদা আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। প্রায় বাইশ বছরের বড়।'

লোকটা মাথা নাড়ল—'অন্য সম্পর্কে আমি তোমার কাকা।' তোমরা আজকালকার ছেলে, সে সব গোলমেলে সম্পর্ক ঠিক বুঝবে না। তাছাড়া ও সম্পর্কের আর কোনো জোর নেই। আমাদের অনেক আপন পর হয়ে গেছে।'

দীপ্তিময়ের মনে হল লোকটা সত্যিই বড় দুঃখিত হয়ে পড়েছে সম্পর্কের দুর্বলতার কথা ভেবে। সে বিরক্ত বোধ করছিল একটু। পুরোনো আমলের কথা, সম্পর্কের কথা একবার শুরু হলে সহজে থামতে চায় না। সে সহজ স্পষ্টভাবে বোঝে যে, এ লোকটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই সত্যিকারের নেই, কেবলমাত্র একই সমাজে বসবাসকারী ছাড়া। আত্মীয়তার জটিলতা এবং তার প্রয়োজন দীপ্তিময় কখনো বোঝে না। সে ধীরে ধীরে বলল—'আমার কিছুই অবশ্য জানা নেই। মনেও নেই।'

লোকটা মাথা নাড়ল—'ঠিকই তো। গতকাল রাঙা বৌদিকে প্রণাম করে যাবো, কথা বলে যাবো ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বৌমা বলল উনি কাউকেই এখন চিনতে পারেন না। কথা বললে বিরত হন। তাই আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করি নি। উনি সুস্থ থাকলে ঠিক চিনতে পারতেন।'

দীপ্তিময় এবার হাসল—'না চিনলেই বা কি? আপনি যা বলছেন তা তো আর মিথ্যে নয়।'

দীপ্তিময়ের কথাটুকুর মধ্যে একটা কিছু ছিল যাতে লোকটা একটু চুপ করে রইল! তারপর আস্তে আস্তে বলল,—'না, মিথ্যে নয়। আজকাল অবশ্য অনেকে নকল পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

দীপ্তিময় এ কথায় উত্তর দিল না। চেয়ে রইল। লোকটা হঠাৎ ময়লা একটা রুমাল বের করে মুখটা মুছল, চোখের কোণে একটু চেপে রাখল রুমালটা, তারপর সরিয়ে নিল। তার চোখের নীচের জায়গাটা ফোলা-ফোলা। মুখে অনেক ভাঁজ আর দাগ। লোকটা হাসল একটু—'তোমাকে আমি অনেক কোলে নিয়েছি। তুমি ছেলেবেলায় দেখতে বড় সুন্দর ছিলে। মেয়েদের মতো এক গা গয়না পরিয়ে রাখা হত তোমাকে।'

সেই কবেকার দীপ্তিময়কে মনে করতে গিয়ে লোকটা অন্যমনস্ক রইল একটু। তারপর অন্যমনে বলল, 'তখন তোমাদের টিকাটুলির বাসায় মাঝে মাঝে যেতাম। তারপর স্বদেশী করার জন্য জেলে চলে যেতে হল। আমার ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে।' বলেই সে হাসল, 'আমিও অবশ্য লোকের ওপর কম অত্যাচার করিনি।'

দীপ্তিময়ের একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। হরেন গাঙ্গুলির সামনে সেটা খাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। যদিও একে সমীহ করার সত্যিই কোনো মানে হয় না। নিতান্তই তুচ্ছ লোকটা। অসফল। তাছাড়া সম্পর্কেও যে তেমন কিছু নয় তা বোঝা যাচ্ছে। তবু সে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করল। লোকটা সেদিকে

চেয়েও দেখল না।

দীপ্তিময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন?'

লোকটি—হরেন গাঙ্গুলি একটু লাজুক হাসল, 'তোমার ঠিকানা পাওয়া তো শক্ত কিছু নয়। কলকাতায় অনেকে চেনে, যাদবপুরে তোমার মেজপিসিমা থাকেন, আমি তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যাই। তিনি প্রথম তোমার খোঁজ দেন। তারপর তোমার অফিসেও একদিন গিয়েছিলাম। তোমার দেখা পাইনি। তারপর ভাবলাম অফিসের চেয়ে বাসায় দেখা করাটাই ভাল; অফিসে তো তোমার কথা বলার বা শোনার সময় হবে না!'

'কথাটা কী?' দীপ্তিময় মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল। ছোট্ট প্রশ্ন, কিন্তু তাতেই ঘরে একটা স্তব্ধতা তৈরী হয়ে গেল। লোকটা চোখ নীচু করে রইল একটুক্ষণ।

দু'হাতে ধরা লাঠিটার কাছ বরাবর মাথা নেমে এল। দুহাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল রমা, মাথায় বড় ঘোমটা, পিছনে বুবুন, তার হাতে বিস্কুটের প্লেট, লোকটা মাথা নুইয়ে ছিল, তার সামনে চায়ের কাপ রেখে রমা একবার দীপ্তিময়ের দিকে চাইল। তারপর লোকটাকে বলল, ফুলকাকা, আপনার চা। সোজা হয়ে বসল হরেন গাঙ্গুলি—এই যে বৌমা, আজই চলে এলাম। ছুটির দিন নইলে তো দীপুকে পাওয়া যেত না।'

'বেশ করেছেন।'

লোকটা হাসল, 'ওর আমাকে মনে নেই। থাকার কথাও নয়। সম্পর্ক তো তেমন কিছু ছিল না, যারা চিনত আমাকে তারা তো সব কে কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে।'

অপ্রাসঙ্গিক কথা, দীপ্তিময় বিরক্ত হল, চোখের ইংগিত করে রমাকে চলে যেতে বলল।

রমা হেসে বলল,—'আপনারা কথা বলুন। আমি আসি।'

রমা চলে গেলে হরেন গাঙ্গুলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা

হয়ে বসল, দীপ্তিময়ের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল 'আমার বড় অভাব চলছে দীপু। এই বুড়ো বয়সে আমি দুবেলা খেতে পাই না।

দীপ্তিময় সোজা লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। দেশ-জোড়া খিদের গল্প। দীপ্তিময় অনেক শুনেছে। তাই তার কোনো ভাবান্তর হল না, সে সহজ চোখেই চেয়ে রইল।

হরেন গাঙ্গুলি আবার বলল, 'বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলাম। আমার দুটো ছেলে নাবালক, মেয়ের বয়স ষোলো। রোজগার বলতে গেলে কিছুই করি না। সংসার অচল। অত সব তোমার শুনে কাজ নেই। তোমার ভালও লাগবে না। আমি তোমার কাছে কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছি।'

সিগারেট ধরাতে দীপ্তিময়ের আর কোনো বাধা রইল না। এখন আর লোকটাকে শ্রদ্ধা না করলেও চলে। কেননা লোকটা ভিক্ষে চাইছে। দীপ্তিময় সিগারেটটা টেবিলে ঠুকে জ্বালিয়ে নিল, লোকটা চেয়ে রইল।

দীপ্তিময় বলল, 'আপনি কী করেন?'

'একটা দোকান ছিল হালতুতে। মালপত্র কিনতে পারি না বলে সেটা প্রায় উঠে যাচ্ছে। সস্তা জিনিস-পত্র বেচি। চলে না। এ সব করার তো কোনো অভ্যাস নেই।'

দীপ্তিময় হঠাৎ বলল, 'আমার খোঁজ না পেলে কী করতেন?

লোকটা চুপ করে কিছুক্ষণ তার কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'ভগবান তোমার খোঁজ দিয়েছেন। যোগা-যোগের ওপরেই তো পৃথিবী চলছে।'

দীপ্তিময় হাসে। আমারও কিন্তু এক সময়ে অভাব ছিল। সে সব দিনে আমি কারো কাছে, কোনো আত্মীয়ের কাছে গিয়ে ভিক্ষে করি নি! আমি যা করেছি সব নিজের পরিশ্রমে।'

লোকটি তাড়াতাড়ি বলল, 'তা তো বটেই।' তারপর একটু ফাঁক দিয়ে বলল, 'তবে তোমার বয়স সহায় ছিল, আর ছিল ভাগ্য।'

দীপ্তিময় হেসে বলল 'দেশের কাজ করেছেন, কিন্তু নিজের কথা ভাবেন নি ? দেশ কি পরিবার ছাড়া ?'

হরেন গাঙ্গুলি ম্লান হাসে, 'ঠিক কথা। দেশের কাজ যে খুব একটা করতে পেরেছি তা নয়। কেবল অনেকদিন জেল খেটেছি, মার খেয়েছি। তবে সে সবের মধ্যেও একটা কিছু করেছি বোধ হয়। আমরা নিজের জন্য কম ভাবতাম।'

'কিন্তু এখন তো ভাবতে হচ্ছে! আপনি ভাগ্যের কথা বললেন, আমি কিন্তু ভাগ্য বলতে পরিশ্রম বুঝি।'

'ঠিক।' হরেন গাঙ্গুলি বুঝদারের মতো মাথা নাড়ে, 'নিজের ভাগ্য বলতে আমরা কিছু বুঝতাম না, দেশের ভাগ্য ফিরলে সকলের সঙ্গে আমারও ফিরবে। দীপু, আমরা ছেলেবেলায় যৌথ পরিবার দেখেছি, সে সব পরিবারে সকলে বড় লোক ছিল না, কিন্তু সকলেই খাবার আর আশ্রয়ের ভাগ পেতো। অনেক হীনতা মন-কষাকষি বিবাদও ছিল অবশ্য। তবু আমাদের শিক্ষা ওখান থেকেই। আমরা খুব দূর আত্মীয়তাও মেনে চলতাম। আমরা খাবার ভাগ করে খেতে শিখেছিলাম।'

মনে মনে রেগে গেল দীপ্তিময়। নিজের পরিবারে বয়স্ক মানুষদের স্বার্থপরতা আর কুটিলতা সে অনেক দেখেছে। সে জানে এদের মহত্ত্ব নামমাত্র। তবু সে মুখে রাগ দেখাল না, তর্কও করল না, কেবল বলল-'তারপর ?

'স্বদেশী যখন করেছি তখনো ঐ রকমই মনে হত। নিজের জন্য কিছু নয়। সকলের জন্য সব কিছু।'

'তার ফলে কিছু হয়েছে ?'

'না' মাথা নাড়ে হরেন গাঙ্গুলি 'কিছু হয় নি। স্বার্থপরতা আরো বেড়ে গেছে। তবু কিন্তু আমার দাবি থেকে যায়।'

'কিসের দাবি ?'

'দেশের জন্য আমি করেছিলাম, দেশও আমার জন্য কিছু করুক।'

দীপ্তিময় হাসে-'তবে দেশই করুক।'

ব্যঙ্গটা হজম করে গেল হরেন গাঙ্গুলি, বলল, 'তুমিও দেশেরই একজন।' বলেই তাড়াতাড়ি হেসে সামলে নিল 'এসব ছেলেমানুষী কথা। তুমি কথা তুললে বলে এসে গেল। আমি প্রাক্তন দেশসেবী হিসেবে তো তোমার কাছে আসিনি। আত্মীয়তার জোরেও না। ছেলেবেলায় তোমাকে কোলেপিঠে করেছিলাম, এখন বুড়ো বয়সে আমি গরীব অসহায়, তুমি যদি দয়া করো সেই আশায় এসেছি।'

ভ্রূ কুঁচকে চায়ে চুমুক দিল দীপ্তিময়। দেখল লোকটা চা বিস্কুট এখনো ছোঁয়নি। সে বলল-'চা-টা খান। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

চায়ের কাপ তুলে নিল হরেন গাঙ্গুলি, বলল 'আমি এ ভাবে এসেছি বলে তুমি বোধ হয় খুশী হওনি, তাই না ?'

দীপ্তিময় চুপ করে থাকে। তারপর এক সময়ে বলে-'আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন, আপনাকে আমি কিছু ভিক্ষে দেবো। তবে...'

কথা শেষ করার আগেই হরেন গাঙ্গুলি দ্রুত চায়ের কাপটা রেখে সোজা হয়ে বসে দীপ্তিময়ের দিকে কঠিন চোখে তাকাল, 'ভিক্ষে দেবে ?'

দীপ্তিময় অবাক হয়ে বলল-'আপনিই তো তা চাইলেন।'

'আমি ভিক্ষে চাইবো ঠিকই। আমার দিক থেকে ওটা ভিক্ষেই। কিন্তু তুমি ভিক্ষে হিসেবে দেবে কেন ?'

উত্তরটার অর্থ ভাল বুঝল না দীপ্তিময়, কিন্তু যথেষ্ট রেগে গেল, 'একে ভিক্ষে ছাড়া কি বলে ?'

ঘরে আর শেষ বেলার লাল আলো ছিল না। তবু দীপ্তিময় দেখল লোকটার চোখে অস্তসূর্যের লাল আভা। চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে লোকটার, তবু শান্তগলায় বলল 'ভগবান তোমাকে অনেক দিয়েছেন। জীবনে তুমি স্বার্থত্যাগ কমই করেছো, কেবল নিজের জন্যই তুমি উপার্জন করেছো, হয়তো তার সবটাই সৎ উপায়ে নয়। তোমার কাছ থেকে আর একটু বিনয় এবং শ্রদ্ধা আশা করেছিলাম।

দরিদ্র দেশে তুমি সুখে আছো, কিন্তু তোমার সেজন্য কোনো লজ্জা নেই কেন! আমি ভিক্ষে চাইলাম বলে তুমি ভিক্ষেই দেবে?'

প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গেল দীপ্তিময়। লোকটার চেহারা, আচরণ খুব সামান্য একটু পাল্টে গেছে, কিন্তু তাতেই তার শরীরে আগুন ধরে গেল। সে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল 'গেট আউট! গেট আউট!'

হরেন গাঙ্গুলি একটু হেসে উঠে দাঁড়াল, 'যদি কখনো লোকে তোমার বুকে ছোরা ধরে যথাসর্বস্ব চায়, তখন এই মেজাজ দেখিও বাপু।'

হরেন গাঙ্গুলি আর ফিরে তাকাল না। মাথা উঁচু রেখে বেরিয়ে গেল।

* * * *

দীপ্তিময় ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ। পারল না। একটা উটকো লোক, ভিখিরি, বাড়ি বয়ে এসে তাকে যা খুশী বলে গেছে—এ চিন্তা তার সুখ নষ্ট করে দিচ্ছিল। রমাকে ডেকে সে সাবধান করে দিল, 'আমি না থাকলে কোনো অচেনা লোককে ঘরে ঢুকতে দেবে না।' বলার দরকার ছিল না, রমা বুঝেই নিয়েছিল। সে কিছু জিজ্ঞেস করল না দীপ্তিময়কে! কেবল ঘাড় নাড়ল।

রাতে মা যখন ভিতরের হলঘরের এক কোণে বসে খই দুধ খাচেছ, তখন দীপ্তিময়ের কী খেয়াল হল, মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—'মা, হরেন গাঙ্গুলি বলে কাউকে চিনতে?'

ঘোমটার ভিতর থেকে মা বোকা চোখে তাকাল, বলল—'কে?'

'হরেন গাঙ্গুলি। স্বদেশী করত, ঢাকায়।'

খানিকক্ষণ চেয়ে রইল মা, তারপর হঠাৎ বলল 'নাট্‌কা? হরেন তো আমাদের সনাতন পণ্ডিতের ছেলে নাট্‌কা।'

নাট্‌কা শুনে দীপ্তিময় একটু চমকে গেল।

মা ঘাড় নাড়ে, নাট্‌কা ছিল ডাকাত। স্বদেশী ডাকাত। বোমা

বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত। খুব গুণ্ডা ছিল। রতনের সঙ্গে পড়ত। খুন করে জেলে যায়। বেরিয়ে আবার ডাকাতি করত।'

'লোকটা ভাল ছিল না, না?'

'এমনিতে ভাল। তবে রাগলে খুব ভয়ঙ্কর! ওর বাবাও ছিল ঐরকম। সনাতন পণ্ডিতকেও কারা যেন খুন করেছিল বিক্রমপুরের এক গ্রামে। নাট্‌কার তখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স।··· তারপর কি যেন হয়েছিল! কি যেন···মা সামান্যক্ষণের জন্য আবার অন্যমনস্ক হয়ে তারপর বলল—ব্রাহ্মণ, হ্যাঁ ব্রাহ্মণ ছিল তারা।'

'কারা?'

'যারা সনাতন পণ্ডিতকে খুন করেছিল। ওদেরই যজমান।'

'নাট্‌কা কি করল?'

'রাম দা দিয়ে দুজনকে কেটেছিল মাঠের মধ্যে আর একজনকে টাকা দিয়ে। পুলিশ ওকে ধরতে পারত না।'

আর জানার দরকার ছিল না দীপ্তিময়ের। নাটকার গল্প সে অনেক শুনেছে। ছেলেবেলায় নাট্‌কা একসময়ে তার বীর ছিল। জ্ঞান হওয়ার পর সে লোকটাকে চোখে দেখেনি। গল্প শুনত যে সেই বিখ্যাত নাট্‌কার কোলে উঠেছে অনেকবার।

মনটা একটু দমে গেল দীপ্তিময়ের। লোকটা বলে যোগাযোগের উপরেই পৃথিবী চলছে। যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত।

লোকটা পরোক্ষভাবে তাকে দায়ী করে গেল। যে দীপ্তিময় সারাজীবন নিজের জন্যই যা কিছু করেছে। একা বাঁচতে চাইছে, ইত্যাদি।

দুরকম চিন্তা দীপ্তিময়কে আচ্ছন্ন করে রইল।

বড় হঠাৎ ঘটে গেল ব্যাপারটা। এরকমটা না হলেই ভাল ছিল যেন। তবু সে ভেবে দেখে লোকটাকে অপমান করে ভালই করেছে। সেই বিখ্যাত ডাকাত নাট্‌কা তো আর নেই। লোকটা এখন ভিখিরি। হয়তো বারবার তার কাছে উমেদার হয়ে আসত হাত পেতে সাহায্য নিত, আর গরীবের দাম্ভিকতা থেকে মনে মনে

তাকে অভিশাপ দিয়ে যেত। এই অভিমানটুকু হয়তো লোকটার কাজে লাগবে। হয়তো এই বুড়ো বয়সে পাপী লোকটা নিজের জন্য ভিক্ষে ছাড়া আরও কিছু করবে এবার।

রাতে পাশে শুয়ে রমা বলল 'আমার কেমন ভয়-ভয় করছে গো!'

'ভয় কিসের!'

'ওরকম বিশ্রী একটা লোক! বুড়ো হোক, যাই হোক এককালে ডাকাত ছিল—সে লোকটার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়ে গেল...'

'দূর। ওসব কিছু না। লোকটা এখন ভিখিরি।' বলে পাশ ফিরে রমাকে জড়িয়ে ধরল দীপ্তিময়। চুমু খেয়ে বলল, 'গাড়িটা বোধহয় সামনের মাসেই পেয়ে যাবো। পেলে সবাই মিলে খুব লম্বা একটা টুর দেবো, বুঝলে!'

*   *   *   *

অফিসের কাজ শেষ করতে প্রায়ই রাত হয়ে যায় দীপ্তিময়ের। যখন বেরোয় তখন প্রায়ই দেখা যায় সাতটা বেজে গেছে। ডালহৌসী থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সে হাওড়ায় আসে। ট্রেনে আসে উত্তরপাড়া।

একদিন অফিসের কাজ শেষ করে ঘড়ি দেখল দীপ্তিময়। দেখল রাত সাড়ে সাতটা। মাথা অল্প ধরে আছে। জলতেষ্টা পেয়েছে, সিগারেট খাওয়া হয়নি অনেকক্ষণ। 'মাথা ভর্তি হাজার চিন্তা। ঘর থেকে করিডোরে বেরিয়ে এসে সে দেখল চারদিক ফাঁকা। অন্যসব সারি সারি অফিসগুলোর দরজায় তালা। শূন্য করিডোর। সে দারোয়ানকে ডাক দিয়ে অফিসের দরজা বন্ধ করতে বলল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে চারতলা থেকে নামতে লগেল।

অনেক উঁচু থেকেই সে একতলা আর দোতলার মাঝামাঝি যেখানে সিঁড়িটা বাঁক নিয়েছে, সেখানে সিঁড়ির রেলিঙে হেলান দিয়ে র্যাপার গায়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে। মাথা মুখ ঢাকা, তলায় ময়লা ধুতি দেখা যাচ্ছে। বোধহয় ভিখিরী।

আস্তে আস্তে নামছিল দীপ্তিময়। গত সপ্তাহে তার রক্তের চাপ বেড়েছিল। এই অল্প বয়সেই এতটা হওয়ার কথা নয়। ডাক্তার

তার খাওয়া-দাওয়ার চার্ট তৈরী করে দিয়ে গেছে। পরিশ্রম কম করতে বলে গেছে। দীপ্তিময় একটু হাসে। তার হাওড়ায় লোহার কারখানায় ষ্ট্রাইক চলছে, সাপ্লাইয়ের ব্যবসাতেও একটু মন্দা, তিন-চারটে সরকারী কণ্ট্রাক্টের জন্যও তাকে ঘুরতে হচ্ছে খুব। বিশ্রামের উপায় নেই। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নামে, মাথাটা একটু ঘোরে। সে রেলিঙে হাত রেখে নামতে থাকে। দূর থেকে অন্যমনে দেখে একতলা আর দোতলার মাঝখানে সিঁড়িতে হেলান দিয়ে কালো র‍্যাপারে মুড়ি দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে দীপ্তিময়ের মনে হয় এত লোভ বুঝি ভাল নয়। সে যথেষ্ট রোজগার করেছে, এবার অন্যদের জন্য ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া যাক, একটু বেরিয়ে আসা যাক বাইরে কোথাও, মানুষের সঙ্গে আরো একটু মেশা যাক। তারপরেই মনে পড়ে কলকাতায় কেনা জমিটার ওপর চমৎকার একটা ফ্ল্যাটবাড়ি তুলতে হবে। প্রতি ফ্ল্যাটের ভাড়া হবে ছশো থেকে হাজার। কিংবা এমনি আরো চিন্তা। তখনই সব ছেড়ে দেওয়ার নামে বুক কেঁপে ওঠে। না, যথেষ্ট হয়নি, একেবারেই যথেষ্ট হয়নি। আরো অনেক কিছু করার আছে··· নামতে নামতে সে দেখতে পায় ভিখিরির মতো লোকটা একতলা আর দোতলার মাঝখানে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে নামতে থাকে। তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে আসে। থেমে একটা সিগারেট ধরায়···সামনের মাসের প্রথম দিকেই গাড়িটা পাওয়া যাবে। বিদেশী গাড়ি—চল্লিশ হাজার দাম পড়ল। লম্বা একটা টুর দিতে হবে এবার। চলে যাবে দেওঘর, রাঁচী, হাজারিবাগ, পরেশনাথ। সঙ্গে থাকবে রমা, পিণ্টু আর বুবুন। বাড়িতে থাকার জন্য কাউকে এনে রাখতে হবে ··সে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। তিন চার ধাপ ওপর থেকে সে দেখে লোকটা রেলিঙে হেলান দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কালো র‍্যাপারে তার মাথা মুখ শরীর ঢাকা, নীচে ময়লা ধুতি, আর পায়ে লাল রঙের কেড্স দেখা যাচ্ছে। এই এজমালী অফিস-বাড়িটায় সারাদিন উমেদার,

ফড়ে দালালদের যাতায়াত, আর আসে ভিখিরিরা। দীপ্তিময় চত্বরে নেমে অন্যমনে লোকটাকে পেরিয়ে গেল। তার গাড়িটার কথাই ভাবছিল সে। চমৎকার আকাশী নীল রঙ...

'দীপ্তিময়!" গম্ভীর গলায় কাছ থেকে কে যেন ডাকল।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল দীপ্তিময়, কালো র‍্যাপার মোড়া সেই লোকটা। ঘোমটার মধ্যে তার মুখ। ভাল বোঝা যায় না। অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় লোকটা অনেকদিন দাড়ি কামায়নি। তার বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। যদিও আবছা, ঢাকা মুখখানা ভাল বোঝা যায় না, তবু মনে হয় এ মুখ সে যেন কবে কোন বাল্যে বা কৈশোরে বহুবার দেখেছিল। স্পষ্ট মনে নেই। তবু মনে পড়ে।

সামান্যক্ষণের জন্য দুজনেই স্থির রইল। তারপর শীর্ণ বাঁ হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা এগিয়ে এল। বাড়ানো হাত-খানার দিকে অর্থহীন অবুঝ চোখে চেয়ে ছিল দীপ্তিময়, হঠাৎ দেখল চাদরের তলা থেকে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এল লোকটার ডানহাত। খুবই অবাক হয় দীপ্তিময়। সে বড় বড় চোখ করে দেখতে পেল লোকটা তার পেটের মধ্যে একটা ছোট্ট সুন্দর ঝক্ ঝকে ছোরা ঢুকিয়ে দিল।

'আঃক্' বলে দীপ্তিময় হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করল। পরমুহূর্তেই সে 'এটা কি? এটা কেন?' বলে চীৎকার করতে চাইল—পারল না, বোবার শব্দের মতো সে কয়েকটা অর্থ-হীন শব্দ করল। দেখতে পেল ছোরার হাতলখানা তার পেটের ওপর উঁচু হয়ে আছে।...প্রথমে দেয়ালে হেলান দেওয়ার চেষ্টা করল দীপ্তিময়...ভয়ংকর বমির ভাব টের পেল...পেটের ওজন... খুব ওজন...দেয়ালে হেলানো তার শরীর আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ল সিঁড়িতে। শূন্য চোখে দেখল কোথাও সেই কালো চাদরে ঢাকা লোকটা নেই। চলে গেছে।...যেন হঠাৎ নিজের শব্দ করার ক্ষমতা সে ফিরে পেল, চীৎকার করল 'রমা-আ, মা-আ...।' দেখল লোকে ছুটে আসছে ওপর থেকে, নীচে থেকে। পায়ের শব্দ...ভয়ে সে

চোখ বোজে। ছোরার হাতলখানা উঁচু হয়ে আছে···সে টের পায় তাকে তোলা হচ্ছে···বোধ হয় একটা গাড়িতে···লোকজন চেঁচাচ্ছে···পেটের ওপর একটা ভার···একটা ওজন···নোনতা স্বাদের বমি উঠে আসছে মুখে···তারপরেই দীপ্তিময় দেখে বাগান আলো করা সবুজ রঙ···তার নিজের বাড়ি···। যদিও অর্থহীন তবু তার এলোমেলো ভাবে মনে হয় সে পৃথিবী থেকে আলাদা করে তার জমি নিয়ে নিচ্ছে তুলে দিচ্ছে ঘেরা পাঁচিল···পাঁচিলের ওপাশে এক অচেনা জগৎ···চালের ওপর বসে দেখতে পায় বাইরের অচেনা অনাত্মীয় মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে···ওরা আর কেউ নয়···হিংসেয় মানুষের বুকে পাথর কেটে যাচ্ছে—দীপ্তিময় কেন সুখে থাকবে? দীপ্তিময় চীৎকার করে বলতে চায় কেন আমি সুখে থাকব না? ···মনে পড়ে সে কারো জন্য কিছু করেনি। নিজের ঘর তৈরি করেছে কেবল···জগৎ বড় পর হয়ে আছে···অচেনা হয়ে আছে মানুষ···অনাত্মীয়···যোগাযোগ নেই···যোগাযোগ নেই···কেবল রমা, কেবল বুবুন, পিন্টু···আর সে নিজে···আমি, আমি আর আমি······

আস্তে আস্তে দীপ্তিময় ঘুমিয়ে পড়তে থাকে···কে যেন তাকে মারল···কেন মারল?···বস্তুত কিছুই তো আর সে নিজের মতো নিতে পারল না···না ঘর বাড়ি বাগান··গাড়িতে চড়া হল না একবারও···ঘের পাঁচিলে ঘেরা পোক্ত বাড়ি তবু নিরাপদ নয়···চার দিক থেকে সাপের মতো অভিশাপ এসে বিষ ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে··· না নিরাপদ নয়···সে রমাকে সাবধান করে দেয়—সাবধান, রমা খুব সাবধান, সদর খুলো না, কাউকে ঢুকতে দিও না···বলে আর দেখে পাঁচিল টপকে চোর ঢুকছে···সদর ভাঙছে ডাকাত···বলছে ভাগ করে খেতে হয়। তুমি অনেক কেড়ে খেয়েছো···হাল ছেড়ে দেয় দীপ্তিময়।···দেখে তার সেই নীল সুন্দর গাড়িখানা লম্বা টুরে পাড়ি দিচ্ছে। জানালায় তার মুখ তাকেই বিদায় জানাচ্ছে। দীপ্তিময় চেয়ে থাকে······

উত্তরের ব্যালকনি

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উল্টোদিকের ফুটপাথে বকুল গাছটায় অনেক ফুল এসেছে এবার। ফুলে ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রঙ ঘন নীল। পরনে একটা খাকী রঙের ফুলপ্যান্ট —লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে। মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগুগে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দুচারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিরল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দু হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাথের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ্য স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফেলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দেখে। পাগল। তবু এখনো চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রঙ, ভোঁতা নাক, বড় চোখ—এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল—সেই যোগফলটাই একটা মানুষ—সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু তুষারের মনে হয়, এখনো অরুণকে চেনা যায় কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচ বছর ধরে অরুণ ঐ গাছতলায় বসে আছে। ঐখানে বসে থেকে থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দাড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এই সব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ঐ চোখে ঘৃণা আক্রোশ, প্রতিশোধ—এই সব কল্পনা করত। ব্যালকনি থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে; পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তা-রাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহ-মানতাকে লক্ষ্য করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনো ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভুত—অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয়

সবচেয়ে বেশী ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজ্‌গিজ্‌ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা ঘরে দেখা দেয়।

কোনো পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনো তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে মানুষ সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাস মতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যাণ্ট শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাস মতো বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ লতা পাতা, আঁকে। আর আঁকে খোঁপাশুদ্ধ মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালই। তার আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একই রকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে সারাদিন।

আজও লম্বা নিম পাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে দেখল কল্যাণী। তারপর বলল স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ঐ এক জবাব।

—বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ঐ সব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল—বিভোর সোমা জবাব দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে যখন তখন দেখবে। সময় মতো স্নান খাওয়া, সময় মতো সব কিছু। এই সব তখন চলবে না—

বলতে বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনো কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ পড়ে আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুল গাছের নিবিড় ছায়া থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না। কি করে। তবু অভ্যাস। পাঁচ বছর ধরে পাগলটা বসে আছে ঐ বকুলগাছের তলায়। পাঁচ বছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাতে লক্ষ্য করেছে ও। ভয় করলে কি চলে।

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিঙ থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক হয়ে থাকা মুখের ভেতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছ্যাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধ মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ঐ ঠোঁট জোড়া ছ'সাত বছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল

একবার। একবার মাত্র। জীবনে ঐ একবার। তাও জোর করে। এখন ঐ নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাতঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্নাঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম গলায় বলে—ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ঐ গাছতলায় এল তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চীৎকার করত, আকাশ বাতাসকে গাল দিত। চীৎকার করে হাত তুলে বলত টেলিগ্রাম···টেলিগ্রাম···। তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে। যদি আক্রমণ করে। তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনো ভালবাসেনি কল্যাণী, সে ভালবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল তুষার কল্যাণীর সংসারের দোর-গড়ায়। চৌকী দিতে লাগল, চীৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা জানালা খুলত না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশী এগোলো না। চীৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না,

উঁচু লোহার খাঁচা। ইঁট কাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রীট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে টং টং করে ছুঁড়ে মারছে। ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ঐ তুচ্ছ শব্দটি—ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ংকর সেই কাঠামোর ভিতরে ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারিদিক আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইট কাঠ পাথরের স্তূপ। ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ঐ শব্দ যেন কখনো শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে—ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কিসের ছুটি! কেন অবসর! সে পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দেয়—কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে! চাইছে অবসর। সে তন্ন তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্যে এখনও পাথর ছুঁড়ে মারছে লোহার বীমের গায়ে।

চৌরঙ্গীর ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন ?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছা করে না। বাড়ি ফেরা—সেই এক-ঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে—সামনের বাঁদিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাবো। কোথায়। তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এবার ? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনো কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবলই মনে হয়—কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবনে।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরানো বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কি একটা মনে পাড়ি পাড়ি করেও পড়ল না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরানো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য কেনা এক প্যাকেট দামী সিগারেট আর দেশলাই

নিয়ে সেই পুরানো বাড়ির তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে—এখনো নিনি আছে কি এখানে ? আছে তো !

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তার ওপর পাঁচ সাত বছর আগেকার সেই নিনি এখনো এখানে আছে কিনা সন্দেহ। যদি না থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার ?

একটু দাঁড়িয়ে ভেবে, একটু ঘুরে ফিরে দেখে তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ। বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে। চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরিজিতে বলল—কাকে চাই ?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না ?

নিনি ওপরের দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডান দিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রঙ মেলেনি। পাঁচ বছরের অন্তত এইটুকু পাল্টেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছো ! বুড়ো হওনি ?

আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছো কিনা। তোমার স্বামী পুত্র হয়নি তো ! হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উল্টে বলল—আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন কাগজে ছাওয়া দেওয়াল, ভাড়া করা ওয়ার্ড-রোব, মেয়েলী আসবাবপত্র। এখনো সেণ্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ মুখময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিও আর গীটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল—তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের ভিতরের তীব্র ইচ্ছাটা এখনো অস্থির অন্ধের মতো বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামী মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ঐ যে গোপনতার ভান করে দামী বোতল বের করা ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে নিনি বারবার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত—মনে রেখো এটা ভদ্র জায়গা। আর, আমি বেশ্যা নই। মাতাল হয়ো না, হুল্লোড় কোরো না।

তুষার হাসল। সে বারবার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকতাময় একটা গৎ গীটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময়ে নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরে তীব্র ইচ্ছেটা গীটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বীমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ ইচ্ছা আনন্দময় আবরণ উন্মোচন, তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো, থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে—কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান ধার দেখিয়ে বলে—গত বছর আমার একটা

অপারেশন হয়েছিল—অ্যাপেণ্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সব কিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটে ফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনান নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরে ব্যালকনি, উল্টোদিকে ফুটপাথে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলোমাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাবনার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপ টাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিরল পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। রাত বাড়ছে। তার খিদে পাচেছ।

পুরানো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। কখনো নির্জন সেক্সপিয়ার সরণী, কখনো চলাচল-কারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গী রোড ধরে বহুক্ষণ হাঁটল সে। এখনো মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুঁড়ে মারছে লোহার বীমের গায়ে। তার মন বলছে এখানে নয় এখানে নয়। চল সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে, ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভুতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কী চাকরী করতে করতে ক্লান্ত? সে কী সংসারের একঘেয়েমী আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছো?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারী বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছো কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না! আমাদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না খেলে চলে না—

কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি? তোমার ঠোঁটে গালে শার্টে লিপস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ—যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেকটা রাত হল আরো। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুল গাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলি ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে অন্ধকার ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়।

সেই ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেবো ? রোজ মঙ্গলা রাতে একবার আসে খাবারটা দিয়ে আসতে। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে ? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন ?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়। বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে ?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুল গাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে খেতে দেখতে লাগল তুষার।

খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না অরুণ ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ঐখানে, ঐ ব্যালকনিতে মাঝে মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখ না ? তার বাঁ গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনো মাছির মতো বসে থাকে—দেখ না ? এখনো আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনো তেমনি উজ্জ্বল রঙ। চেয়ে দেখ না অরুণ ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনো গাড়ি বারান্দার

তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে করবে প্রত্যক্ষ।

—তোমার কোনো নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছো অরুণ। তোমার মুক্তি নেই?

ডাল তরকারীতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাথের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার কাঠামো, তার ভিতরকার ঝুঝুকো আঁধার আর একবার দেখা গেল। লোহার বীমের গায়ে নুড়ি পাথরের টুং টুং শব্দ। অবিরল অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কিসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দেখে তুষার, চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে, বিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড় বিড় করে বলে— কেন তোমার জন্য ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান? আমাকে দিতে পারো তো?

বৃথা। সবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু আর কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি একটি পোকার মতো উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায়

অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভিতরটা ধক ধক করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দুহাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কিসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুমভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো বুক কাঁপে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন হ্যামার। অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে—চলো সমুদ্রে! চলো পাহাড়ে। চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড়ে ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে তাকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দেখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখনার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চার ধারে। অনেক দূর হেঁটে যায় তুষার।

ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনোদিন ওঠে না। হেঁটে হেঁটে চলে যায় বহু দূর। কী একটা কাজ বাকী রয়ে গেল জীবনে! করা হল না। এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে। সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনো বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতি-স্তম্ভ, তার নীচে বকুল গাছ তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেট্-এর মশারির ভিতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটাতে খোঁপাশুদ্ধ একটা মেয়ের মুখ, নীচে লেখা সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিন্ত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চলো, বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি। এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি। দার্জিলিঙ শিলঙও দেখা।

—অন্য কোথাও। অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে—মনে মনে ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। এক মাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার হঠাৎ বলে ওঠে—ন্‌নাঃ। বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরী ডিকটেশন দিতে দিতে বলে ওঠে—ন্‌নাঃ। স্টেনোগ্রাফারটি বিনীতভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদিকে চায়। অদৃশ্য মশারীর মতো কী একটা ঘিরে আছে চারদিকে। ওটা কী! ওটা কেন? কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপীয়ার সরণী ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভীড়ের মধ্যে। বহু দূরে দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোরে চালাও ভাই। আরো জোরে...আরো জোরে...

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারিদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মতো একটা ক্রেন হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বীমে নুড়ি ছুঁড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়। সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দেয় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছে থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাওনা সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের ঘরে। যাবে অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দু' বেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দেন। আজকাল কেউ এতটা করে না কারো জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন।

—বলি, ঐরকম মহাপ্রাণ হয়ে উঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি।

কিন্তু ভাবে তুষার। ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে –ন্‌নাঃ। চমৎকার! জালবদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনও মাঝে মাঝে ক্রেন হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণার বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এক রাতে সত্যিই তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুলগাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনোদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিয়ন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দেখ কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল একটা চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন্‌ঠিন্‌ শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল।

ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছে থেকে অরুণকে অনেকদিন দেখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা। খালাসীদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা। খাকী প্যাণ্টের রঙ পাল্টে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনো অকৃপণ সুন্দর, সুন্দর বকুল ফুলে ছেয়ে আছে ওর মাথায় জটায় ঘাড়ে।

কাঁপা হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নীচু রেখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে তুষার বলছিল—খাও অরুণ, খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার। নিয়ে এল ঘরে।

—এই দেখ আমার ঘরদোর। ঐ যে মশারির নীচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দেখ, ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দেখ ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ঐ ড্রেসিং টেবিল। এই দেখ, আরো কত কী……

ঘুরে ঘুরে অরুণকে সব দেখায় তুষার।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না অরুণ? ইচ্ছে করে না এই সব জিনিষপত্রের মালিক হতে? তুমি চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বৌ? সোমার মতো মেয়ে।

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো অরুণ, ইচ্ছে করে না ?

—অন্ধকার ! ভীষণ অন্ধকার ! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার ?

—এইখানে।

বলে চারদিকে চায় পাগল।

আর কোথায় ?

—চারদিকে।

—থাকবে না অরুণ ? থাকো থাকো। থেকে দেখ।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার।

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুল গাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্য লগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে !

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তুষার। চেয়ে দেখে নিশ্চিন্তে বকুল গাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দেখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না অরুণ ? বকুল গাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে ! হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোনো সন্দেহ নেই। সে কাছে থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থরথর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে

আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এবার। বকুল গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে। ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরোনো কম্বল পাঠিয়ে দেয় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনো! কে জানে? মাঝে মাঝে উগ্র বিরংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনো দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর, ঐ যে ভালবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী? বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার, বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সব সময়ে উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম করে নেমে আসে। অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুল গাছটার গোড়ায় পাগলকে দেখে। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানী এবার ঊনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ক্লান্তি বাড়ে। দিন শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দেয় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দেয়। নাড়া দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোকা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে।

তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারদিকে আধো আলো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি স্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনো ফুল বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।

পাগল বসে থাকে।

———